কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী প্রশাসন এবং তার পুলিশ দাবিপত্র দিতে দিল না

গত ১০ এপ্রিল ৬টি সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানসহ জরুরী ৯ দফা দাবিপত্র নিয়ে নবান্নতে মুখ্যমন্ত্রীর সমীপে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রশাসন সর্বোতভাবে বাধা দেয়। গোটা নবান্ন জুড়ে হই হই পড়ে যায়।

ঘটনা হল, একদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর অবিরাম দমন-পীড়ন—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ধর্মঘটের অধিকারের উপর আঘাত, হয়রানিমূলক অভিসন্ধিপরায়ণ বদলী, দপ্তর পুনর্গঠনের নামে বিভিন্ন অফিসের স্থানান্তর, পদাবলুপ্তি ও কর্মচারীদের বদলী অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বঞ্চনা—৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া, ৫ম বেতন কমিশনের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ সহ অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি (কারিগরী কর্মচারীদের জন্য)-র সুপারিশ রূপায়ণ না করা—এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এই নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। পূর্বের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চারটি সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যুক্ত কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও স্টিয়ারিং কমিটি এবং বর্তমানের আশা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (নব পর্যায়) এই ছটি সংগঠনের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর নতুন বার্তা দিয়ে গত ২৭ মার্চ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে একটি বিশাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশন থেকেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী ও জ্বলন্ত দাবি- সনদবদ্ধ করে (৯ দফা দাবিসমূহ-সংগ্রামী হাতিয়ার মার্চ '১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে দাবিসনদ পেশসহ আগামী দিনে বৃহত্তর লড়াইয়ের আহ্বান জানানো হয়। এই ঘটনায় সারা পশ্চিমবাংলায় আলোড়ন পড়ে যায়।

এই কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৮ এপ্রিল '১৪ সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয় যে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পত্র দিয়ে কর্মচারীদের বকেয়া দাবি দাওয়া সহ অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে ইতোমধ্যে অনেকগুলি পত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেগুলির কোনো প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আমাদের কাছে পৌঁছায় নি। চিঠিতে আরও বলা হয়, "কর্মচারীদের জরুরী দাবিগুলি নিয়ে আগামী ১০ এপ্রিল বেলা ১টায় আমরা আপনার সমীপে দাবিপত্র পেশ করতে চাই, ব্যস্ততার জন্য আপনার পক্ষে সম্ভব না হলে আপনার মনোনীত কারোর কাছে আমরা এই দাবিপত্র পেশ করব।"

রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবন (নবান্ন) নাকি কারাগার?

তদনুযায়ী ১০ এপ্রিল '১৪ নবান্নতে বেলা ১টার পূর্বে সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ মিলিত হন। নেতৃবৃন্দ আসার খবর পেয়ে নবান্নতে কর্মরত প্রথম সারির কিছু সংগঠকরাও জড়ো হন। চতুর্দিক পুলিশ প্রহরায় পরিবৃত নবান্ন। উত্তর দিকের গেটে প্রবেশ মুখে (জনসাধারণ, কর্মচারীদের জন্য) রয়েছে র‍্যাফ-এর জওয়ানরা, রয়েছে আই বি-র লোকজন। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য লোকজন। এক দুর্গের চেহারা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের কেন্দ্র। জনগণের সরকার আছে না! যাই হোক পৌনে একটা নাগাদ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনগুলির সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক সহ সমবেত কর্মীদের

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Chief Minister's Office
"NABANNA", West Bengal Secretariat,Howrah-711102
Acknowledgement of Receipts

Receipt No	:	8683
Date	:	08/04/2014
Subject	:	APPOINTMENT FOR DEPUTATION
Memo No	:	Nill
Type	:	Appointment for meeting / deputation
Receiving from	:	Manoj Kanti Guha West Bengal State Co-Ordin ation Committee & Others 10A, Sankharitola Lane Kolkata-700 014, Ph. : 9433353660
Date & Time	:	08/04/2014, 12:43

৮ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারের অনুলিপি

একটি অংশ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে লিফটের সামনে এসে জড়ো হন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ৮ এপ্রিলের চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় প্রাপ্তিস্বীকার করে একটি প্রাপ্তিপত্র দেয় যেখানে ১০ এপ্রিল '১৪ বেলা ১টায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন বিষয় হিসাবে উল্লেখ ছিল (প্রাপ্তি পত্রের অনুলিপি ছাপানো হল)। নেতৃবৃন্দ লিফটের সামনে জড়ো হলে পুলিশ জায়গাটি কর্ডন করে ফেলে। পুলিশ আধিকারিকরা চলে আসেন। তাঁরা বলতে থাকেন, 'আপনারা এভাবে যেতে পারবেন না, নির্দেশ আছে।' সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নির্দেশের প্রতিলিপি দেখতে চাইলে, তাঁরা বলেন, মৌখিক নির্দেশ আছে, 'ওপরে যাওয়া যাবে না।' নেতৃবৃন্দ অবিচলিত থাকেন তাঁরা ওপরে যাবেনই। দু'দিন আগে জানানো সত্ত্বেও এবং সাধারণ সম্পাদকের

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিবাদ পত্র

পত্র নং ঃ কো-অর্ডি-২৮/১৪ তারিখ ঃ ০৩ এপ্রিল, ২০১৪
কলকাতা
মাননীয় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক,
পশ্চিমবঙ্গ।

মহাশয়,

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, নির্বাচনবিধি অনুযায়ী রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মচারীরা নির্বাচনী প্রাক্-প্রস্তুতিমূলক সমগ্র কর্মকাণ্ডে আপনার নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকেন।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নির্বাচনী দপ্তরগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এক্ষেত্রে মাপকাঠি ঠিক করা হচ্ছে কর্মচারীর সাংগঠনিক আনুগত্যের ভিত্তিতে। এমনও দেখা গেছে যে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর সরকারী কর্মচারীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। একই মাপকাঠির বিচারে অভিজ্ঞ কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না। অবসরপ্রাপ্ত, অস্থায়ী / চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যাবে না এই মর্মে নির্বাচনী 'হ্যান্ড বুক'-এ সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা পরিকল্পিতভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এমনকি নির্বাচনী বিধিকে উপেক্ষা করে সরকারী কর্মচারীদের নির্বিচারে বদলীও করা হচ্ছে।

নির্বাচনী কার্যে যুক্ত সকল স্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকদের 'পরিচয় পত্র' প্রদান এবং তাঁদের 'নিরাপত্তা' সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে প্রতিটি কর্মচারী ও আধিকারিকদের যাঁরা নির্বাচনী কার্যে নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন / হবেন তাঁদের প্রত্যেককে তাঁদের অপশন অনুযায়ী পোষ্টাল ভোট অথবা ই.ডি. ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ইতোমধ্যে আধিকারিকসহ কর্মচারীরা প্রাক্-নির্বাচনী কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অসত্য যুক্তিহীন অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তাতে কর্মচারী সংগঠনের নামও ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এতে যুক্ত হয়ে পড়ছেন যা খুবই পরিতাপের বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকসহ কর্মচারীদের নির্বাচনের পরে দেখে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিচ্ছেন। রাজ্যের ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়াগুলিতে এইসব ঘটনাগুলি প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ কর্মচারীদের পরিবারগুলিতেও আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মচারীরা প্রশাসনের কাছ থেকে কোনোরূপ সাহায্য পাচ্ছেন না। সমগ্র প্রশাসনে একটা ভয়ার্ত, হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তাই, সুবিচারের আশায়, আপনার কাছে দ্রুত এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

৪৩তম গ্রাহক বর্ষের আহ্বান

দুঃসময়ে আমাদের প্রকৃত মিত্র হোক সংগ্রামী হাতিয়ার

গোটা রাজ্য জুড়ে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিতে সংগ্রামী হাতিয়ার-এর নতুন বর্ষের গ্রাহকভুক্তি জোর কদমে চলছে। মে মাসের মধ্যে তা সমাপ্ত করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীগণ বর্তমানে এই কর্মসূচীকে সফল করার উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রয়াস জারি রেখেছেন। সংগঠনের আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মের মতনই মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তির কর্মসূচীটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে কেন্দ্রের সরকার দেশের আর্থিক সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন বিদেশনীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করে চলেছে। যে সময়ে রাজ্যে বিগত তিন বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পরিচালিত হবার পরিণতিতে নৈরাজ্য, দুর্নীতি, নারীদের উপর লাঞ্ছনা, খুন ক্রমবর্ধমান। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আর্থিক ও অন্যান্য সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন এবং কর্মচারীদের প্রিয় সংগঠনের উপর নানাবিধ আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এইরকম কঠিন সময়েই নানা বিভ্রান্তি থেকে কর্মচারীদের দূরে সরিয়ে রাখার কঠিন কাজটি করে থাকে সংগ্রামী হাতিয়ার। কর্মচারীদের মন থেকে হতাশা, ভীতি দূর করে সাহস সঞ্চার করার মহান দায়িত্ব ৭ মে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তার প্রথম সংখ্যা থেকে পালন করে আসছে আমাদের প্রিয় মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই কোনো স্বৈরাচারী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করার দৃপ্ত ঘোষণা করে লেখা হয়েছিল—"আজ সারা পশ্চিমবাংলায় এক আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য শাসকশ্রেণী মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্ষেত-খামারে, কলে-কারখানায়, অপিসে-দপ্তরে, পাড়ায় পাড়ায় এগিয়ে আসছে মানুষ সীমাহীন ঘৃণা আর জ্বলন্ত বিক্ষোভ বুকে নিয়ে। ... কঠিন লড়াই লড়বে মানুষ। লড়বে রাজ্য সরকারী কর্মচারী। ... ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তীব্র সংগ্রামের বার্তা সেদিন দিয়েছিল সংগ্রামী হাতিয়ার। শুধু তাই নয়, জনগণের সংগ্রামের সাথে কর্মচারীদের সংগ্রামকে সম্পৃক্ত করার ঘোষণাও করা হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ৪৩ বছরের দৃপ্ত পদচারণায় এই পত্রিকা কখনও কোনো শত্রুর সাথে আপোস করে নি। তার সাক্ষী আছে ইতিহাস। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী

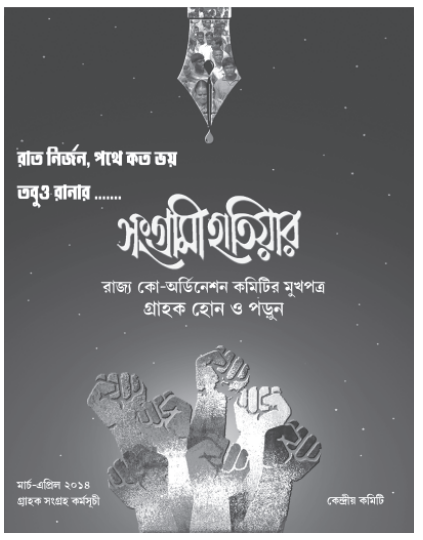

কর্মচারীদের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মতোই অত্যন্ত প্রিয় তার মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার।

আক্রান্ত কর্মচারীদের পাশে দাঁড়ানোর সংগঠনগত যে পরম্পরা তা ফুটে ওঠে সংগ্রামী হাতিয়ারের পাতায় পাতায়। পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ৭ মে, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার আগের সময় অবধি, প্রথম ভাগ। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তৃতীয় ভাগ। দ্বিতীয় ভাগের ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের সময় গণআন্দোলন বিকাশের সহায়ক পরিবেশ কর্মচারী আন্দোলনকে বেগবান ও আরও বলশালী করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। জনগণ ও কর্মচারীদের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার করা বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে সংগঠন-আন্দোলন পরিচালনা ও পত্রিকা প্রকাশনার

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
এপ্রিল ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
দ্বিচত্বারিংশত্তম বর্ষ □ দ্বাদশ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

স্বাগত ১৪২১—দূষণমুক্ত হোক বাংলার সমাজ ও রাজনীতি

রাজনীতি এক বহমান প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি, সেই নীতির প্রায়োগিক ত্রুটি চিহ্নিত করে গঠনমূলক সমালোচনা, সেই নীতির অন্তর্বস্তুগত দুর্বলতা দূরীকরণে কার্যকরী সুপারিশ অথবা জনসাধারণের স্বার্থের নিরিখে সেই নীতির সীমাবদ্ধতার দিকগুলি উন্মোচিত করে বিকল্প নীতির চর্চা—সামগ্রিকতায় এই হল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সারাৎসার। সতত প্রবাহিত এই রাজনৈতিক স্রোতে মানুষকে অবগাহন করতেই হয়, নিজস্ব উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অথবা ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পরোক্ষে। একে এড়িয়ে চলার কোন উপায় আধুনিক কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই নেই।

তবে রাজনীতির বহমান ধারায়, আনুপাতিক ভাগ হারের বিচারে, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পরোক্ষে যুক্ত হয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা—এই দুইয়ের মধ্যে পাল্লা কোন দিকে ভারি হবে, তা নির্ভর করে জনচেতনার সাধারণ স্তরের ওপর। অর্থাৎ সচেতনতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ বা প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, এ এক প্রমাণিত সত্য। অবশ্য এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য এবং তা হল—রাজনৈতিক কর্মকান্ড মানে শুধুমাত্র কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অনুগামী হিসেবে ভূমিকা পালন করা নয়। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন, ছাত্র-যুব-মহিলা ও শিক্ষকদের আন্দোলন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বৃহত্তর পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

এই নিরিখে ঔপনিবেশিক কালে এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও যথাক্রমে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গ এবং পশ্চিমবাংলার স্থান যে অগ্রগণ্য, এ নিয়ে সম্ভবত বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। প্রাক-স্বাধীন দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও রাষ্ট্রশক্তি প্রণীত আর্থ-সামাজিক নীতিসমুহের অসারতা, সীমাবদ্ধতা, জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্র প্রভৃতি কারণে জনমানসে সৃষ্ট ক্ষোভকে রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবাহিত করার কাজটি বঙ্গবাসী উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। প্রকারান্তরে উন্নততর সাধারণ চেতনার স্তরই, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অবিভক্ত বাংলা তথা পশ্চিমবাংলাকে 'ভাইব্র্যান্ট পলিটিক্স্'-এর সূতিকাগারে পরিণত করেছিল। গোখ্‌লের বহুল প্রচারিত মন্তব্য, 'হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স্ টুডে, ইন্ডিয়া উইল থিংক টুমরো'—বাংলার রাজনীতি সচেতনতারই স্বীকৃতি।

বাংলার এই রাজনীতি সচেতনতা কোন যাদুমন্ত্রে অর্জিত ফল নয়। এরও পশ্চাদ্‌পটে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরা—সমাজ বিজ্ঞান যাকে 'নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁ' রূপে চিহ্নিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে বিভিন্ন মধ্যযুগীয় কু-প্রথা (সতীদাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি) বিরোধী যে সামাজিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল, তা-ই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে ক্রমান্বয়ে স্বদেশ চেতনা ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আবার জাতীয়তাবাদের একটি পরিশীলিত ধারা (যেখানে জাতীয়তাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল) বামপন্থার জন্ম দেয় এবং বামপন্থী আন্দোলনই স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির মূলস্রোতে পরিণত হয়। সংসদীয় ক্ষমতার অলিন্দে অবস্থান নিরপেক্ষভাবে, স্বাধীনতা-উত্তর সমগ্র কালপর্বেই বামপন্থীদের এই নির্ণায়ক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পশ্চিমবাংলার রাজনীতির এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা এক আদরণীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে এবং এতাবৎকাল লালন করেছে। এই সময়কালে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি বহু উথাল-পাথালের সাক্ষী থেকেছে, আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছে, গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে রাজনীতির শ্বাসরোধ করার চেষ্টা হয়েছে, আবার সব কিছুকে পরাভূত করে মানুষের রাজনীতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—ঘটনার এই ঘনঘটার মধ্যেও তার নিজস্ব 'সংস্কৃতি' কখনও ভূলুণ্ঠিত হয়নি। তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা-পাল্টা সমালোচনা প্রভৃতি সব কিছুরই কেন্দ্রে থেকেছে রাজনৈতিক বক্তব্য। তির্যক চিত্র-মন্তব্য, হাস্যরসে পূর্ণ ছড়া-গান ইত্যাদির ব্যবহারও হয়েছে, কিন্তু তা-ও কখনও রাজনীতির শালীনতার নিজস্ব গন্ডীকে অতিক্রম করেনি। অথচ গত কয়েকবছর ধরে পশ্চিমবাংলায় এই ঐতিহ্যকেই ভাঙ্গার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ শুধু রাজনীতির নিজস্ব অভিমুখ থেকে বিচ্যুতি বললে সবটা বোঝা যাবে না। মৌখিক ও শারীরিক ভাষায় এমন কিছু বিষয়কে আমদানি করা হচ্ছে যার সাথে কোন ধরনের রাজনীতির (দক্ষিণ, বাম বা মধ্য) কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যদি বলেন, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীর সাথে চা পর্যন্ত খাবেন না, কেউ যদি বলেন, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল বেজন্মা, কেউ যদি বলেন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়ে বিষ দিয়ে মারো—এর মধ্যে আর যাই হোক রাজনীতি নেই। পশ্চিমবাংলা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করত, তারতো ছিঁটে-ফোঁটাও নেই এর মধ্যে। লক্ষণীয় বিষয় হল এই ধরনের মন্তব্য যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমদানি করা হচ্ছে, তা কোনো একজন বা দু'জন ব্যক্তি বিশেষের কু-অভ্যাস নয়। বা আকস্মিক প্রতিক্রিয়াবশত উচ্চারিতও নয়। কারণ ব্যক্তি বিশেষের কু-অভ্যাস হলে, তাকে দলীয় পর্যায়ে বা সর্বাধিনায়কের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যেত। আবার আকস্মিক প্রতিক্রিয়াবশত উচ্চারিত হলে, স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা চাওয়াই হত স্বাভাবিক। কিন্তু তারও কোন বহিঃপ্রকাশ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। সবথেকে দুশ্চিন্তার বিষয় হল যিনি একটি দল তথা প্রশাসনের সর্বময় কর্তা, তাঁরও বাক্যবিন্যাস বহুক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ভাষ্যের সীমা লঙ্ঘন করছে। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, হঠাৎ করেই এই ধরনের প্রবণতা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে হাজির হল কেন? এগুলি কী শুধুমাত্র উদ্দেশ্যহীনভাবে নিক্ষিপ্ত কিছু বাক্যবাণ? না, আদৌ তা নয়। বরং এর পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রশাসনিক চূড়ান্ত ব্যর্থতা যখন মানুষকে ক্ষুব্ধ করে, অসহিষ্ণু করে—তখন সেই ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতাকে সুস্থ রাজনীতির স্রোতে যুক্ত করার দায় বর্তায় সংগঠিত শক্তিগুলির ওপর। বিপরীতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সেই সংগঠিত শক্তিগুলিকে হীনবল করার চেষ্টা করা হয়— যাতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তারা সঠিকভাবে পালন করতে না পারে। অপরদিকে সংগঠিত শক্তির উদ্যোগ ব্যতিরেকেও ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু মানুষ কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ততাভিত্তিক রাজনীতির স্রোতে অবগাহন করতে চায়, চায় অন্তত ঘটনাকেন্দ্রিক (যেমন নির্বাচন) ভূমিকা পালন করে ব্যর্থ প্রশাসনের মুখের ওপর জবাব দিতে। অপরাধ জগতের ভাষা ব্যবহার করে টেরর তৈরী করার কারণই হল জবাব দিতে প্রস্তুত এই অংশের মানুষকে পিছু হটিয়ে দেওয়া। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় যাতে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে জবাব চাওয়া মিছিলে পা মেলাতে না পারেন। পশ্চিমবাংলায় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্-পর্বে তাই এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে (অপরাধ জগতের ভাষা ব্যবহার এবং অপরাধমূলক কাজ) জারি রয়েছে।

অতঃকিম? সত্যিই কি মানুষ ভীত হয়ে, যে সুযোগ তার সামনে হাজির হয়েছে, তাকে হেলায় হারাবেন? অপরাধ জগতের ভাষা কি মানুষের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, না কি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ভিত্তিক দৃপ্ত পদচারণা অসংসদীয় ভাষা উচ্চারণে অভ্যস্ত অপরাধী মুখগুলিকে সমুচিত জবাব দেবে? এ এক ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব। পশ্চিমবাংলার রাজনীতি আজ এক সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। যার একদিকে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহমান স্রোত, আর একদিকে অপরাধ জগতের হাতছানি। জীবন ও জীবিকাকে রক্ষার প্রাথমিক শর্তই হল সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। সুতরাং পশ্চিমবাংলার রাজনীতিকে দূষণমুক্ত করার যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তার সার্বিক ও কার্যকরী ব্যবহারই আজকের সময়ের চাহিদা।

১৯ এপ্রিল, ২০১৪

'সততা' যখন কপ্টারবাহী

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই, দুইটি প্রধান সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতামূলক প্রচারে লিপ্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ নির্বাচন পরবর্তী পর্বে ইহারাই সংসদে শাসক দল ও প্রধান বিরোধী দল হিসেবে অবস্থান করিতেছিল। স্বভাবতই শাসকদল এবং বিরোধীদল রূপে উহাদের ভূমিকা ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করিয়া, জনতার দরবারে দ্রুতলয়ে হাজির হইবার বাসনা অন্যায় নহে, বরং স্বাভাবিক। কিন্তু যাহা লক্ষ্যণীয় তাহা হইল প্রচারের অন্তঃসারশূন্যতাকে আড়াল করিবার জন্য, বহিরঙ্গীয় জাঁকজমকে বিপুল খরচের বহর। ইহা যেন চাহিদা নাই এমন কোন পণ্যের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বর্ণময় মোড়কে আবৃত করিয়া বাজারজাত করিবার কৌশল।

ইহা সর্বজনবিদিত যে চিরকালই উক্ত দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রচার সংক্রান্ত বিপুল ব্যয়ভার বহন করে দেশীয় এবং বিদেশে বসবাসকারী দেশজ শিল্পপতি গোষ্ঠী। যাহাদের পোশাকি নাম 'কর্পোরেট লবি'। বর্তমানে নয়া উদারবাদী পর্বে বিদেশী ধনের প্রবাহও যে এই লক্ষ্যে ঘটিতেছে না তাহা হলফ করিয়া বলা সম্ভব নহে। 'কর্পোরেট লবি'-র এই দুইটি দলকে মুক্ত হস্তে দান করিবার কারণই হইল, উহারা নিশ্চিত থাকেন, ঐ দুইটি দলের যে দলই ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করুক না কেন, কর্পোরেট স্বার্থ সুরক্ষিত রাখিবার লক্ষ্যেই যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হইবে। এই দুইটি দলই ধনপতিগণের স্বার্থে কাজ করিতে বদ্ধ পরিকর থাকিলেও, গুটি কয়েক ধনকুবেরের স্কন্ধে ভর করিয়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হইবার কোন সুযোগ নাই। জনগণের স্কন্ধে ভর করিয়াই নির্বাচনী বৈতরণী পার হইতে হয়। অতএব পাঁচ বৎসরব্যাপী জনসাধারণকে উপর্যুপরি শোষণ করিয়া রিক্ত নিঃস্ব করিয়া ফেলিলেও, প্রাক্ নির্বাচনী পর্বে পুনরায় উহাদের (জনগণ) সাথে তঞ্চকতা করিবার জন্য জনমোহিনী রূপ পরিগ্রহ করা অতীব জরুরী। আর এই জনমোহিনী রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য যে সজ্জার প্রয়োজন তাহারই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আধুনিক কুবের গোষ্ঠী।

ইহাই এযাবৎকালের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হইলেও, বর্তমান সময়ে দুইটি দলের খরচের বহর দেখিয়া চক্ষু চড়ক গাছ হইবার যোগার। নির্বাচন কমিশন প্রার্থী পিছু খরচের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিলেও, রাজনৈতিক দল পিছু তেমন কোন বাধ্যবাধকতা না থাকিবার ফলে ঐ দুটি দলের পক্ষ হইতে জলবৎ খরচের প্রবাহ চলিতেছে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় হইল, মদীয় রাজ্যের শাসকদলটিও, নির্বাচনী প্রচার কার্যে সর্বভারতীয় দুইটি দলের সহিত পাল্লা দিয়া দেদার খরচ করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এক ব্যক্তি যেমন কপ্টারে আরোহণ করিয়া কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী চরকি পাক খাইতেছেন, তেমনই মদীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কপ্টার বাহিত হইয়া পাহাড় হইতে সুন্দরবন উড়িয়া বেড়াইতেছেন। কপ্টারে সাময়িক যান্ত্রিক বিভ্রাট ঘটিলেই নেত্রী কুপিত হইতেছেন। তাঁহার কোপদাহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ বেসরকারী বিমানেরও বন্দোবস্ত হইতেছে। অর্থাৎ 'মাটি' প্রেমী নেত্রীর পদযুগল এখন আর মাটিতে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না। তিনি এখন প্রকৃত প্রস্তাবেই নভঃচারী।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, সাম্প্রতিক অতীতে গণহত্যার নায়ক এক ব্যক্তিকে 'বিকাশ পুরুষ'এর ছদ্মবেশে প্রেজেন্টেবল করিবার দায় যে কর্পোরেট লবির, উহারাই তাঁহার কপ্টার ব্যয় বহন করিতেছে। তাহা হইলে নেত্রীর ক্ষেত্রেও স্পনসরর কি তাহারাই? নচেৎ এই বিপুল ব্যায়ের উৎস কি? নেত্রীর দলের কর্মীবৃন্দ বাড়ি বাড়ি সফর করিয়া কুপনের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন— এমন অভিজ্ঞতা কাহারও হয় নাই। অর্থ জনসমক্ষে সংগৃহীত হইতেছে না। অথচ জনসমক্ষেই জলবৎ খরচ হইতেছে, এ এক অত্যদ্ভুত ধাঁধাঁ। সততার প্রতিমূর্তিও ক্ষণে ক্ষণে 'আমরা গরিব পার্টি' বলিয়া জাহির করিলেও গরিব পার্টির ধনকুবেরগণের ন্যায় কপ্টার প্রেম-এর রহস্য উদঘাটন করিতেছেন না। অতীতে শুনা যাইত, তাঁহার ক্যানভাসের ওপর প্রতিটি তুলির টান কোটি টাকায় ক্রয় করিবার জন্য চিত্রপ্রেমী খরিদ্দার ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত (এমন সৌভাগ্য লিওনার্দো বা ভ্যান গগের হয় নাই)। অঙ্কন শেষ হইতে না হইতেই, তাহা কোটি টাকায় বিক্রীত হইত এবং নগদে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দলীয় তহবিলে নাকি জমা পড়িত! কিন্তু এমন 'ছেলে ভোলানো' কাহিনীও বর্তমানে কর্ণগোচর হইতেছে না। সম্ভবত তাঁহার ছবি আঁকিবার বাসনা ও সময় উভয়েরই অভাব ঘটিতেছে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলিতেছেন 'ছবি' না থাকুক 'সারদা', 'টেট', 'ত্রিফলা'-তো রহিয়াছে। তাহা অবশ্যই, কিন্তু ইহাই কি সব? কর্পোরেট স্পনসরশিপ বা সাগরপারের বদান্যতা ..... খোলসা করিয়া বলিলেই হয়। নৃত্যানুষ্ঠান যখন শুরু হইয়াই গিয়াছে, তখন আর অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন কি?

৫ বৈশাখ, ১৪২১

শোক সংবাদ

প্রয়াত অন্যতম সেরা কথাশিল্পী

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

লাতিন আমেরিকা তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের জীবনাবসান হয়েছে ১৭ এপ্রিল গভীর রাতে (ভারতীয় সময়)।

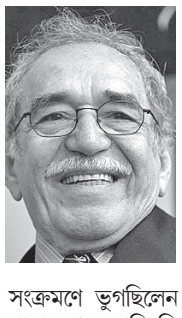

স্প্যানিশ ভাষার এই কিংবদন্তী লেখকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর স্ত্রী মার্সিদিস বার্চা এবং দুই ছেলে রডরিগো ও গঞ্জালো বর্তমান। বেশ কিছুদিন ধরে ফুসফুস ও মূত্রনালির সংক্রমণে ভুগছিলেন। ন'দিন হাসপাতালে থাকার পরে বাড়ি ফিরে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মার্কেজ।

কিউবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সমর্থক গার্সিয়া মার্কেজের জন্ম কলম্বিয়ায়। তবে দীর্ঘদিন ছিলেন মেক্সিকো সিটিতে। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড'। লাতিন আমেরিকার সামাজিক বিভাজনের ক্ষত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে তিনি আলোড়িত করেছিলেন। স্প্যানিশ ভাষার লেখক মার্কেজ বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি পঠিত লেখকদেরও অন্যতম ছিলেন। স্বৈরাচারের বিরোধিতা, বামপন্থার প্রতি বিশ্বাস, লাতিন আমেরিকার বিদ্রোহ-আলোড়নের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগাযোগ প্রস্ফুটিত হয় তাঁর সৃষ্টিতে। সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন তাঁর পেশা ছিল। তাঁর উপন্যাসমালার মধ্যে রয়েছেঃ নো ওয়ান রাইটস টু কর্নেল, লাভ ইন দি টাইম অফ কলেরা, ক্রনিকল অফ আ ডেথ ফোরটোল্ড, মেমোরিজ অফ মাই মিলানকোলি হোর, অটাম অফ দি প্যাট্রিয়ার্ক, মেমরিজ অফ লাভ অ্যান্ড আদার ডেমনস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নানা কাহিনী নিয়ে ছবিও হয়েছে। তিনি ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। □

দাবিপত্র দিতে দিল না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টেলিফোন নম্বর দেওয়া সত্ত্বেও কেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় নীরব—এ ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ জিজ্ঞাসা করেন। গণতান্ত্রিক দেশে কর্মচারী সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে দাবিপত্র নিতে আপত্তি কোথায়? কোনো আলোচনা নয়, দাবি মেটানো নয়, শুধু দাবিপত্র গ্রহণ, তাও কেন সম্ভব নয় বারংবার একথা বলাতে পুলিশ আধিকারিকরা অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তাঁদের অবস্থান হল, তাঁরা কোনো অবস্থাতেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে যেতে দেবেন না। তাঁদের এই অনড় মনোভাবে সমবেত কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়, নেতৃবৃন্দ দেখা করার প্রশ্নে অনড় থাকায় শেষপর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার র‍্যাঙ্কের একজন পুলিশ অফিসার এসে নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে গিয়ে কথা বলে বিষয়টি দেখছেন। নেতৃবৃন্দ যেন অপেক্ষা করেন।

অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে তিনি জানান, যে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কোড অফ কন্ডাক্ট চালু থাকায় তাঁরা এই দাবিপত্র নিতে পারছেন না। নির্বাচন মিটে গেলে তারপর তাঁরা এই দাবিপত্র নেবেন। এই আশ্চর্য হাস্যকর যুক্তির অবতারণায় উপস্থিত কর্মী-নেতৃবৃন্দ হতবাক হয়ে যান। নেতৃবৃন্দের যুক্তি ও তর্কের ঠেলায় পুলিশ আধিকারিকরা দৃশ্যত অসহায় হয়ে পড়েন। দাবিপত্র নেওয়া হবে না। এই খবর মুহূর্তে দাবানলের মতো সমগ্র নবান্নে ছড়িয়ে পড়ে। কর্মচারীদের পেটে লাথি মেরে সরকার শাসন চালাচ্ছে। আই এ এস, আই পি এস অফিসারদের মহার্ঘভাতা বাকি পড়ে না, পড়ে যত সাধারণ কর্মচারীদের। এই পরিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ সমগ্র বিষয়টি 'প্রেস'-এর কাছে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তদনুযায়ী তৃতীয় তলে থাকা প্রেস কর্ণারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এবারেও পুলিশ আবার ঘিরে ধরে, এবং বলে 'প্রেস'-এর কাছে যাওয়া যাবে না, যাওয়ার অনুমতি নেই। ও.সি বলেন 'প্রেস' আই অ্যান্ড সি এ-র আন্ডারে। এ কথায় সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীরাও হকচকিয়ে যান। গোটা নবান্নর চত্বর জুড়ে কলরোল ওঠে, 'প্রেস' নাকি আই অ্যান্ড সি এ-র আন্ডারে! পশ্চিমবঙ্গেই এটা সম্ভব। সম্ভব এই নবান্নতে। প্রশাসন কেন্দ্র নয়, এটি কারাগার। বাস্তিল-দুর্গ। এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে যাবেন না। পুলিশ আধিকারিকরা অবশ্য একতলায় থাকা মুখ্যমন্ত্রীর একটি দপ্তরে দাবিপত্র জমা দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।

যাই হোক, নেতৃবৃন্দ সমবেত কর্মচারীদের পরিস্থিতি অবহিত করেন এবং সেদিনের দাবিপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচী সাঙ্গ করেন।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তার মনোভাব। পরবর্তীকালে ৯ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়। □

পেইড জনমত সমীক্ষা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে প্রচারমাধ্যম সংক্রান্ত আলোচনায় কয়েক বছর পূর্বে 'পেইড নিউজ' শব্দবন্ধটি যুক্ত হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (পি সি আই)-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে—"কোনো খবর বা বিশ্লেষণ মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করার জন্য যখন অর্থ বা অন্য সুবিধা প্রদান করা হয়।" এই বিষয়টি এক অশনিসঙ্কেত। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের সময় এটি জনসমক্ষে আসে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুদা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে বলেন যে, 'নির্বাচনের আগে আমি দেখি হরিয়ানার একটি বড় দৈনিক যাদের একাধিক সংস্করণ রয়েছে, তারা আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার করে চলেছে। আমি তাদের মালিককে ডেকে পাঠাই এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তারা জানায় যে আমাদের বিরোধীদের কাছ থেকে তারা এর জন্য টাকা পেয়েছে। বিরোধীদের কাছে প্যাকেজ বিক্রি করে তারা সংবাদ ছেপেছে জেনে আমি তাদের সেটা বন্ধ করতে বলি। বদলে আমি তাদের প্যাকেজে পাল্টা টাকা দিয়ে আমাদের সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ছাপতে বলি। তারা এরপর তাই করেছে।'

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বান (পরে আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে পদত্যাগ করেন) পেইড নিউজে অংশগ্রহণের বিষয়টি স্বীকার না করলেও নিজেই জানিয়েছেন যে নির্বাচনে জয়ের জন্য তিনি ১১ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। 'আউট লুক' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত বয়ান কংগ্রেসের মুখপত্র হুসেন দলওয়াই বলেছেন 'টাকা না দিলে নির্বাচনে আমাদের পার্টির হয়ে লেখার মতো সংবাদপত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের হয়ে প্রচারের জন্য সংবাদপত্রের মালিক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে পৃথক পৃথক চুক্তি করতে হয়েছিল আমাদের।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের শেষে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের তিনদিন পূর্বে তিনটি পৃথক সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বানের প্রশংসাসূচক 'সংবাদ' পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য ছিল না, শব্দচয়নও ছিল হুবহু এক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মারাঠা জনপ্রিয় দৈনিক 'লোকমত'। প্রচার সংখ্যার নিরিখে এটি মহারাষ্ট্রে প্রথম এবং সারা দেশে চতুর্থ। এই পত্রিকায় অশোক চহ্বানের গুণগান করে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে। উপরন্তু 'অশোক পর্ব' নামে চার পৃষ্ঠার রঙীন ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রটির পরিচালন গোষ্ঠীর ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন রাজেন্দ্র দারদা। এই প্রচারপর্বে তিনি ছিলেন অশোক চহ্বানের মন্ত্রিসভার একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্বাচনের পর অশোক চহ্বান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হলে পুরস্কার স্বরূপ রাজেন্দ্র দারদাকে পূর্ণমন্ত্রী করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজ্যের 'সংবাদ প্রতিদিন' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রটির নাম সামনে চলে আসে। এই পত্রিকাটি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এমনভাবে প্রচার চালায় যেন এটি একটি দলীয় মুখপত্র। এর পুরস্কার স্বরূপ এর মালিক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হন। পরে সংবাদপত্রটির মালিক ও সর্বময় কর্তৃত্বে আসীন হন এর পুত্র। আবার পিতার সাংসদ মেয়াদ শেষ হলে সেই পদে স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র। এই পত্রিকার মালিক পক্ষের মূল মুনাফার জন্য জাহাজ ব্যবসাসহ একাধিক ব্যবসা আছে। অর্থাৎ মিডিয়া-রাজনৈতিক দল-বাণিজ্যিক গোষ্ঠী—এ এক চক্র। এই সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।

বিভিন্ন নির্বাচনে পেইড নিউজের পাশাপাশি মতামত সমীক্ষাও সংগঠিত হয়। এইসব সমীক্ষার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের পূর্বাভাষ প্রকৃত ফলাফলের ধারে কাছে থাকে না এবং এমনকি কখনও কখনও ফলের বিপরীতচিত্র প্রকৃত ফলাফলে দেখা দেয়। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে যে পেইড নিউজের পর নির্বাচনী আঙিনায় কি পেইড সমীক্ষার অঙ্কের ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছে?

এক

নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই ভোট জ্যোতিষিরা (যাদের পোষাকী নাম সেফোলজিস্ট) মাঠে নেমে পড়ে। এরা সমীক্ষার নামে কোন দল কত আসন পাবে, সে সম্পর্কে নিদান হেঁকে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মেলে না। আনন্দবাজার পত্রিকা তার নিজের করা সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে স্বগতোক্তি করে বলেছে "জনমত সমীক্ষা যে সব সময়ে মেলে তা নয়।" (আঃ বাঃ পত্রিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এপর্যন্ত এবিপি আনন্দ-এসি নিয়েলসনের যৌথ সমীক্ষার তিনটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। একটি সমীক্ষা ২০১৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ১২ জানুয়ারির মধ্যে। দ্বিতীয় সমীক্ষা করা হয়েছে ৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আর তৃতীয় সমীক্ষাটি হয়েছে মার্চ মাসে। এইসব সমীক্ষার সুর একটাই। তা হল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি এবং এই রাজ্যস্তরে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক এগিয়ে। দ্বিতীয় সমীক্ষার পর আনন্দবাজার পত্রিকার (২৩ ফেব্রুয়ারি) শিরোনাম ছিল 'এগোচ্ছেন মমতা-মোদী'। আর তৃতীয় সমীক্ষার পর পত্রিকাটির শিরোনাম (৩১ মার্চ) ছিল 'অন্যরা পিছলেও এগিয়ে তৃণমূল।' তিনটি সমীক্ষার প্রথমটিতে এনডিএ-কে ২২৬টি (বিজেপি ২১৭টি), ইউপিএ-কে ১০১টি (কংগ্রেস ৭৩), এবং বামেদের ৩০টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ২৬টি আসন দেওয়া হয়। প্রথম সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ১৩টি, দ্বিতীয় সমীক্ষায় ১০টি, তৃতীয় সমীক্ষাতেও একই আসন ছিল।

এখন এই সমীক্ষার পক্ষে বলতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য হল এই যে, ২০১১-এর বিধানসভা ভোটের বুথ ফেরত সমীক্ষায় এবিপি আনন্দ-এসি নিয়েলসেনের সমীক্ষা প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়। কিন্তু আনন্দবাজার যা বলেনি, তা হল যে এর পূর্বে একাধিক নির্বাচনে যে পূর্বাভাষ তারা দিয়েছিল তা বাস্তবের ধারে-কাছে ছিল না।

খুব বেশি অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ২০০১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-টিএমসি জোট হয়। নির্বাচনের পূর্বে পাঁচটি সংস্থার ছয়টি মতামত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। এর দুটি নিম্নে দেওয়া হল।

২০০১ সালের নির্বাচনী সমীক্ষা ও প্রকৃত ফলাফল

টাইমস অব ইন্ডিয়া -ডি আর এস	বামফ্রন্ট ১১৫-১৩৫	কং-টিএমসি ১৪০-১৭০	প্রকৃত ফল বামফ্রন্ট কং-টিএমসি
	বুথ ফেরত সমীক্ষা		
ডি আর এস-দূরদর্শন	১৫০	১৩৮	১৯৯ ৮৬

পূর্বোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো সংস্থারই পূর্বাভাষ মেলেনি। অবশিষ্টগুলির মধ্যে এশিয়ান এজ এবং দ্য উইক-এর সমীক্ষায় বামফ্রন্টকে তো হারিয়েই দেওয়া হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা নিজেও বেশ কিছু কেন্দ্রে সমীক্ষা চালায় এবং বলাই বাহুল্য অধিকাংশ কেন্দ্রেই তারা বামফ্রন্ট প্রার্থীকে হারিয়ে দেয়। এমন কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

আনন্দবাজারী পূর্বাভাষ ও প্রকৃত চিত্র

কেন্দ্র	আনন্দবাজারী পূর্বভাষ	প্রকৃত ফলাফল
১। পলাশীপাড়া (নদীয়া)	"বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী ক্ষোভে বানভাসি। স্বভাব কবি কমলেন্দুবাবু যেন ছন্দ হারিয়ে ফেলেছেন।" (৮ মে)	কমলেন্দু সান্যাল জয়ী।
২। এন্টালী (কলকাতা)	"সুলতান আহমেদের জনসংযোগই এই মুহূর্তে কিছুটা এগিয়ে রেখেছে তাঁকে।" (৫ মে)	বামফ্রন্ট প্রার্থী মহম্মদ সেলিম ৬২৩০ ভোটে জয়ী হন।
৩। কলকাতা	"এবার কলকাতায় সিপিএম সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে। বেলগাছিয়া পশ্চিম ও তালতলা ছাড়া বড়ো জোর আর একটি আসন তারা পেতে পারে।" (১৩ মে)	আনন্দবাজারের দেওয়া দুটি আসন ছাড়াও আরও ছয়টি কেন্দ্রে বামফ্রন্ট জয়ী হয়।
৪। জলপাইগুড়ি	"চা-বাগান অধ্যুষিত জলপাইগুড়ি জেলা এবার আর হেলায় জিতে নিতে পারবে না বামফ্রন্ট।" (২৫ এপ্রিল)।	১২টি আসনের ১১ টিতে জয়ী বামফ্রন্ট।

এখানেই শেষ নয়, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে এই আনন্দবাজার পত্রিকা কি লিখেছিল তা দেখা যেতে পারে। ওদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল 'দূরদর্শনের জন্য ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সার্ভিসেস (ডি আর এস) যে একজিট পোল করেছে তার ফলাফল জানার পরেই তৃণমূল-কংগ্রেস শিবিরে যেমন উল্লাস, তেমনই বাম শিবিরে থমথমে ভাব। দলের সমর্থকদের নির্ভয়ে ভোট দেবার সাহস জোগাতে সারাদিন মেদিনীপুরে কাটিয়ে রাতে শহরে ফেরার পথে একজিট পোলের ফল জেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক মন্তব্য, তাহলে আমরাই সরকার গড়ছি।"

আর এই প্রশ্নে আনন্দবাজারের নিজস্ব বিশ্লেষণ কী ছিল? ১৩ মে অর্থাৎ ফল প্রকাশের দিন পত্রিকাটিতে ভাবী 'মুখ্যমন্ত্রী'র প্রোফাইল প্রকাশ করে পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল "আসুন আলাপ করে দিই। মানুষটি মনে প্রাণে পুঁজিবাদী মার্গারেট থ্যাচারের বাঙালি সংস্করণ। ২৪ বছরের কমিউনিস্ট ভূত ঝেড়ে ফেলে বিশ্বায়িত বিশ্বের প্রতিযোগিতার জগতে পশ্চিমবঙ্গকে জেতাতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য যা যা করা দরকার তা পাঁচ বছরেই করে ছাড়বেন পশ্চিমঙ্গের নয়া কর্ণধার।"

নির্বাচনী ফলাফলে জোটের বিপর্যয়ের পর আনন্দবাজারের এক সাংবাদিক (বর্তমানে 'এই সময়' দৈনিকের সম্পাদক) লিখলেন, "আগাগোড়া মমতা মনে করেছেন, স্রেফ তার জনপ্রিয়তার জোরেই তিনি রাজ্যে ক্ষমতায় বসে যাবেন। তাঁর কোনো সংগঠনের প্রয়োজন নেই। একা কুম্ভ মমতা ফাইনাল ম্যাচে হেরে গেলেন বামপন্থীদের লালগড়ে সত্যিকারের কোনো আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়ে।" হেরে যাওয়ার পর বোধোদয়!

২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেও একাধিক মতামত সমীক্ষা ও বুথফেরত সমীক্ষা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল স্টার নিউজ, আজতক, জি নিউজ ও এন ডি টি ভি। এদের পূর্বাভাষ ও প্রকৃত ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল ঃ

২০০৪-এর পূর্বাভাষ ও প্রকৃত ফলাফল

	বিজেপি জোট	কং জোট
স্টার নিউজ	২৭০-২৮৬	১৫৪-১৭০
আজতক	২৮২	১৬৫
জি নিউজ	২৬৯-২৭৭	১৮৪-১৯০
এন ডি টিভি	২৪০-২৬০	১৯০-২১০
প্রকৃত ফলাফল	১৮৬	২১৬

এক্ষেত্রে সমীক্ষার পূর্বাভাষ তো মেলেইনি, বরং প্রকৃত ফলাফল হয়েছে সমীক্ষার বিপরীত।

২০০৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকা বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য মার্কশিট তৈরি করে পাশ-ফেল চালু করেছিল। যেমন তারকেশ্বর কেন্দ্রে প্রতীম চট্টোপাধ্যায় ১০০-এর মধ্যে ৫৯ পেয়ে (৯ মে), সুশান্ত ঘোষ গড়বেতা পূর্ব কেন্দ্রে ১০০-এর মধ্যে ৫৮ (১২ মে) পেয়ে আনন্দবাজারের চোখে 'ফেল' করলেও জনগণের রায়ে বিপুলভাবে পাশ করেছিলেন। অন্য দিকে চৌরঙ্গী কেন্দ্রে সুব্রত মুখার্জী ১০০-র মধ্যে ৬৩ পেয়ে (১৩ মে) এবং রাণাঘাট পশ্চিম কেন্দ্রে শঙ্কর সিং ১০০-এর মধ্যে ৬৩ পেয়ে (১৩ মে) আনন্দবাজারের কাছে পাশ করলেও জনগণের রায়ে চূড়ান্তভাবে ফেল করেছিলেন।

এই নির্বাচন সম্পর্কে বর্তমান পত্রিকার মালিক সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্তর বিশ্লেষণ ছিল বিশেষ কৌতুক প্রদ। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন অর্থাৎ ১১ মে বর্তমান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ওনার স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল "ওদের আসন সংখ্যা তো এবার অনেকটাই কমবেই, এই ভোটে বামফ্রন্ট হেরে গেলেও অবাক হবে না।" এই লেখায় তিনি নিদান হাঁকেন—"আমি আমার চিরাচরিত প্রথায় বা পথে যেসব খবরাখবর এবং তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাতে বিশ্বাসই করতে পারছি না সিপিএম এবার কোনোভাবে ভালো ফল করতে পারে।"

ভোটের ফলাফল ১১ মে প্রকাশিত হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১২ মে বর্তমান পত্রিকায় "ফলাফল ঃ আমার বক্তব্য" শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বরুণ সেনগুপ্ত লেখেন "প্রথমেই স্বীকার করছি, রাজ্যের এবারের ভোটের ফলাফল সম্পর্কে আমার অনুমান একেবারেই মেলেনি।—আমি আগেও স্বীকার করেছি, আজও স্বীকার করছি এবারের ভোটে কোনো এলাকা থেকেই ছাপ্পা ভোটের তেমন খবর পাওয়া যায়নি।" কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন করে ১৪ মে একটি নিবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল "এবার কি ওরা ভোটের মেশিনে হাইটেক রিগিংয়ের সাহায্যে নির্বাচন জিতল?" এই নিবন্ধ থেকে জানা গেল যে বরুণবাবুকে দু'চারজন লোক টেলিফোনে 'খুব নিচু গলায়' জানিয়ে দেন "আপনাদের জানাতে চাই এবারের ভোটে এক ধরনের মারাত্মক হাইটেক রিগিং হয়েছে।"

দুই

আনন্দবাজার পত্রিকা মতামত সমীক্ষার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য ২০১১ সালের বুথ ফেরত সমীক্ষার দৃষ্টান্ত হাজির করেছে। এর দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। আসলে বিগত দুই-তিন দশক ধরে রাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনের আগে বা পরে বিভিন্ন সমীক্ষায় 'বামপন্থীরা হারছে' এটা বলা হয়েছে। একটা সমীক্ষাতেও বামপন্থীরা জিতছে বা জয়ী হতে পারে—এর সামান্য ইঙ্গিতও ছিল না। ফলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যখন নানান কারণে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে গেছে তখন 'সমীক্ষা মিলে গেছে' বলে চিৎকারের কোনো অর্থ হয় না বা এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে সমস্ত সমীক্ষার ফলাফল ধ্রুব সত্য।

আসলে এইসব সমীক্ষার অনেক পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে, যা হিসেবের মধ্যে আনা দরকার। যেমন **প্রথমত**, খুব কম সংখ্যক ভোটারদের মধ্যে এইসব সমীক্ষা চালানো হয়। যেমন এবিপি আনন্দ-এ সি নিয়েলসনের দ্বিতীয় দফার সমীক্ষায় ১৮টি রাজ্যের ১২৯টি নির্বাচনী ক্ষেত্রের মাত্র ২৯ হাজার ২৫২ জন উত্তরদাতার মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ফলাফল তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের ৫৪৩টি কেন্দ্রের মাত্র ২৩.৭৫ শতাংশ এবং মোট প্রায় ৮২ কোটি ভোটারের মাত্র ০.০০৪ শতাংশের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এত অতি ক্ষুদ্র নমুনার ভিত্তিতে নির্মিত সমীক্ষার ফলাফল কখনও সত্য হতে পারে? **দ্বিতীয়ত**, এবারের ভোটারদের মধ্যে ২ কোটি ৩১ লক্ষ নতুন ভোটার। ৩৫ বছরের কম বয়সী ভোটারের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ। এছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সামাজিক অবস্থান, পেশাগত অবস্থান এবং সর্বোপরি জাতপাত ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভাজন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্যাম্পেলের মধ্যে কখনোই প্রতিফলিত হতে পারে না। **তৃতীয়ত**, 'লাই ফ্যাক্টর' গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ উত্তর দাতারা সবসময়ে সত্য কথা নাও বলতে পারেন। 'আমার ভোট গোপন ব্যাপার' এই মানসিকতা থেকে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, তাছাড়া নির্বাচনের তিন-চারমাস পূর্বে যে মত ছিল, নির্বাচনের সময় নানান কারণেই তার পরিবর্তন হতে পারে। এসব ত্রুটি সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় নেই।

পূর্বোক্ত কারণের জন্যই জনমত সমীক্ষা বা এমনকি বুথফেরত সমীক্ষা কখনও নির্ভুল হতে পারে না। তবে এই ধরনের চর্চা পরিসংখ্যান বা অঙ্কশাস্ত্রের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাঁদের কাছে বা সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

কিন্তু বাজারী সমীক্ষার উদ্দেশ্য গবেষণা নয়। সম্প্রতি একটি হিন্দি টেলিভিশন চ্যানেলের গোপন ক্যামেরার 'স্টিং অপারেশনে' ধরা পড়েছে, টাকার বিনিময়ে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের অনুকূলে ফলাফল প্রকাশের ঘটনা। অর্থাৎ পেইড নিউজ-এর পাশাপাশি পেইড সমীক্ষাও এখন বাজারে চলে এসেছে। খুব সঠিকভাবেই জনমতকে বিভ্রান্ত করা বা যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর অর্থ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করার এই অশুভ প্রয়াস বন্ধ হওয়া দরকার। প্রেস কাউন্সিল, নির্বাচন কমিশন সহ কেন্দ্রীয় সরকারকে পেইড নিউজ, পেইড সমীক্ষা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে হবে। □

কর্মসংস্থানের ধোঁকাবাজি

বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু তাদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রশ্নপত্র তৈরির ওয়ার্কশপের নামে খানাপিনার খরচ হয়ে গেছে দেড় লক্ষ টাকা। খরচের বহর দেখে তাজ্জব অর্থ দপ্তর।

এই অভূতপূর্ব নজির গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর অধীন প্রশাসন ও কর্মীবর্গ দপ্তরের স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এস এস সি)। এতাবৎকালের সাংবিধানিক নিয়োগ সংস্থা পি এস সি (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) এর ক্ষমতা খর্ব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

২০১২ সালের ৪ অক্টোবর সল্টলেকের একটি হোটেলে বসেছিল ওয়ার্কশপ। একদিনেই চা, কফি, ঠাণ্ডা পানীয় সহ খাওয়া-দাওয়াতে সরকারের খরচ হয়েছে ৬৮ হাজার টাকা। মাসখানেকের পরে সেই হোটেলেই ওয়ার্কশপের নামে আবার মোচ্ছব। এবার খরচ ৭৬ হাজার টাকা।

চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য 'প্রশ্ন ব্যাঙ্ক' গড়ার জন্যই নাকি ওয়ার্কশপ। বিলাসবহুল হোটেল ছাড়া তা আর কোথায়ই বা হবে!

২০১২ সাল থেকে প্রায় চারবার হোটেলের বিল অনুমোদন না করে ফেরৎ পাঠায় অর্থদপ্তর। বিল অনুমোদন করেনি পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসও। অনেক তদ্বির হয়, শেষে উচ্চপর্যায়ের হস্তক্ষেপে বিল পাশ হয়।

নিয়োগের এই সামগ্রিক কাজটাই আগে করতো পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তাদের সূত্রে খবর সাধারণভাবে যে কোনো বিষয়ের উপর প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপর। এক একটা বিষয়ের জন্য সেই বিষয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র করিয়ে নেওয়া হতো, অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হতো দেড় হাজার টাকা।

একদিকে এখন ওয়ার্কশপের নামে প্রশ্ন ব্যাঙ্ক তৈরির প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা লঙ্ঘনের চূড়ান্ত আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে সরকারী অর্থ লুঠের রমরমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাগাড়ম্বরই হোক গত আড়াই বছরে রাজ্য সরকারের শাসনে রাজ্যে শিল্পায়নের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। বিনিয়োগ না হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ অন্তর্হিত।

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও কোনো কোনো দপ্তরে নিয়োগের অধিকার পি এস সি বা এস এস সি কারোর কাছেই নেই। কারা সেই নিয়োগ করবে তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যাও সরকার দেয়নি। তবে বিজ্ঞপ্তি বা চাকরির নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়াই শুধু মন্ত্রীদের নির্দেশ অনুসারে সরকারী বিভাগে নিয়োগ হচ্ছে। সেচ বিভাগ, ওয়েস্টার্ন সার্কেল সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের আদেশনামা নং ৮-৪/১২/২২/১ তারিখ ৭/১/১৩-তে গ্রুপ ডি পদে অস্থায়ী লোকজন নিয়োগ করা হয়েছে। এক জায়গায় ৪২ জন, আরেক জায়গায় ১৮ জন। সেচ বিভাগ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানেল ডিভিশনে ৮৫ জন অস্থায়ী গ্রুপ-ডি নিয়োগ করা হয়েছে। রিভার রিসার্চে ২৭ জন এইরকম অস্থায়ী গ্রুপ-ডি নিযুক্ত হয়েছে। আধিকারিকদের বক্তব্য অনুসারে সবই হচ্ছে সেচদপ্তরের প্রশাসনিক ব্যাপার। লোকসভার ভোট ঘোষণার আগের দিন অবধি এই প্রক্রিয়া চলেছে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের করণিকের তিন হাজার পঞ্চাশটি শূন্য পদে পরীক্ষা নেয় এস এস সি। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ আবেদনকারীর এই পরীক্ষায় এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। পরিকাঠামো নেই বলে এস এস সি'র পরীক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল বেসরকারী সংস্থার হাতে। আদৌ নিয়োগ হবে কিনা কেউ জানে না। কিন্তু পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান শাসকদল তাদের ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিল 'এ রাজ্যে এক কোটি বেকারের চাকরি দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য'। বেকার যুবকেরা গত আড়াই বছরে কি পেলেন? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বদলে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক। নাম নথিভুক্ত করেছেন ১৮ লক্ষ যুবক যুবতী। কাজ পেয়েছেন মাত্র ৫০০ জন। কর্মসংস্থানের চমক দিতে হয়েছে গ্রীণ পুলিশ। ১ লক্ষ ৩০ হাজার। এরা অবার তিন মাস বেতন পাননি। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর আবার এঁদের কিছু লোককে এখন ডেকে এনে বেতন দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এসব চলছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ কলকাতায় কাজের সুযোগ কমেছে ৭ শতাংশ। কর্মসংস্থানের গুরুতর সমস্যা সমাধানে কোনো পরিকল্পনাই গৃহীত হয়নি। কাগজে কাগজে প্রকল্পের বিজ্ঞাপন আর মঞ্চে উঠে ভাষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সমস্যা নিরসন করা যাবে না। □

গুজরাট কখনই দাঙ্গামুক্ত রাজ্য নয়

নরেন্দ্র মোদী সবসময়েই দাবি করছেন, 'গুজরাট দাঙ্গামুক্ত রাজ্য'। কিন্তু তাঁর এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা। অন্তত সরকারী তথ্য তাই বলছে। এটা দেখা গেছে, দেশের যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিংসার ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘটেছে, তার নেপথ্যে থেকেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ।

২০১৩ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যার নিরিখে দেশের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যেই রয়েছে গুজরাট। ঐ বছর রাজ্যে ৬৬টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা হিংসার ঘটনা ঘটেছে। শুধু ২০১৩ সালই নয়, সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা এর আগের বছরগুলি থেকেই ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। ২০১২ সালে গুজরাটে ৫৭টি এই ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটেছে; যাতে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ২০০২ সাল-পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গার সংখ্যার নিরিখে গুজরাট নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের প্রথম চারটি থেকে ছয়টি রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করেছে। ২০১২ সালে লোকসভায় দেওয়া তথ্য অনুসারে ২০০৯ থেকে ২০১২-র মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয়েছিল ৩৪৪ জন; যার মধ্যে গুজরাটে বলি হয়েছিল ৩২ জন। অর্থাৎ প্রায় ১০ শতাংশ। ঐ সময়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার ২ হাজার ৩০০টি ঘটনার মধ্যে ১৮১টি হয়েছিল গুজরাটে। □

ভোট এলেই—কেবল সংখ্যালঘু উন্নয়নের কথা

ভোটের জন্যই কি শুধু সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা মনে পড়ে। একথা বলতে হচ্ছে কারণ ক্ষমতার অলিন্দে থাকার জন্য সংখ্যালঘুদের প্রতি মেকি দরদ দেখে।

সাধারণভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের মতো জরুরী প্রশ্নেও সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সংখ্যালঘু দপ্তরের দায়িত্বে। কিন্তু দপ্তর নিয়ে এমনকি বিধানসভাতেও বিধায়কদের কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দিতে নেত্রী উপস্থিত থাকছেন না, দিনের পর দিন। বিধায়কদের কোনো গঠনমূলক মতামত বা পরামর্শও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। কোনো আলোচনা বা মতবিনিময়ের সুযোগও নেই। সংখ্যালঘু দপ্তরকে চূড়ান্তভাবে হেলাফেলা না করলে কোনো সরকার এমন আচরণ করে না। ভোট উতরানোর জন্য নয়, প্রকৃত অর্থেই সংখ্যালঘু উন্নয়নের কাজ করা উচিত।

সংখ্যালঘু প্রশ্নে বর্তমান রাজ্যের শাসকদলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিশ্রুতির বহর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনী ইস্তেহার ভিশন ডকুমেন্ট থেকে।

প্রতিশ্রুতিঃ সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থানের প্রাধান্য দেওয়া হবে (বাংলা ইস্তেহার পৃষ্ঠা ৩৫)

প্রকৃত অবস্থা ঃ মাদ্রাসাগুলিতে একটিও নতুন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী পদ সৃষ্টি হয়নি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন কোনো পদ সৃষ্টি হয়নি। রাজ্যের শ্রম দপ্তরের ডাইরেক্টরেট অফ এমপ্লয়মেন্টের তৈরি করা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০১২-১৩-তে রাজ্যের শ্রম দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়কে জানিয়েছে যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ ২০১৩-তে রাজ্যে কাজ হয়েছে মাত্র ৭৩ জনের। নাম লিখিয়েছিলেন ৫৯ হাজার সংখ্যালঘু মানুষ। তার মধ্যে মুসলিম প্রায় ৫৬৩৫৮ জন।

প্রতিশ্রুতি ঃ সংখ্যালঘু উন্নয়নে বিশেষ তহবিল এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নে বিশেষ কমিশন গঠন করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার পৃষ্ঠা ৩৫)

প্রকৃত অবস্থা ঃ কোনোটাই হয়নি। উল্টে সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা রাজ্য সরকার খরচ করতে পারেনি। ২০১১ সালে বিগত সরকারের বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল ৬১২ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালে সেই বরাদ্দ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭ কোটি টাকা।

প্রতিশ্রুতি ঃ মাদ্রাসাগুলিতে কারিগরি শিক্ষার জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ (ভিশন ডকুমেন্ট পৃষ্ঠা ৪৩)

প্রকৃত অবস্থা ঃ প্রচার হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। গত তিনটি বাজেটে কোথাও এর উল্লেখ নেই।

প্রতিশ্রুতি ঃ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে রাজ্যে আরও বিশ্ববিদ্যালয় হবে, এক হাজার দিনের মধ্যে (ভিশন ডকুমেন্ট পৃষ্ঠা ৫৬)

প্রকৃত অবস্থা ঃ এক হাজার দিন পেরিয়ে গেছে, কিছুই হয়নি।

অতঃপর সরকার গঠিত হয়েছে। প্রতিশ্রুতির বহর বেড়েছে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির পরিণতি কি!

সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে সখ্যতা

আর এস এস-র অন্যতম শীর্ষ নেতা 'ব্রেন আছে' নেত্রীকে 'সাক্ষাৎ দুর্গা' হিসাবে প্রশস্তি করেছিলেন। ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে আর এস এস-এর মুখপত্র 'পঞ্চজন্য'-র সম্পাদক তরুণ বিজয়ের লেখা একটা বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নেত্রী দীর্ঘ ভাষণে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন আর এস এস-কে। বলেছিলেন ''আপনারা প্রকৃত দেশপ্রেমী। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন''। এইচ ভি শেষাদ্রি, মোহন ভাগবত, মদন দাস দেবী প্রমুখের উপস্থিতিতে নেত্রী বলেন 'একসঙ্গে এতজন আর এস এস নেতার সঙ্গে আমি আগে বৈঠক করিনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি''। (সূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ, ২৬/৯/২০০৪)।

গুজরাট দাঙ্গার পরও সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ছিলেন নেত্রী। ২০০১-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা লাভের আশায় কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ছেড়ে শতবর্ষের অধিক প্রাচীন দলের হাত ধরেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকদের সাথে বোঝাপড়া শেষ হয়নি। ২০০০ থেকে ২০০৫ কলকাতা কর্পোরেশনে নেত্রীর দলের নেতা ছিলেন মেয়র আর ডেপুটি মেয়র ছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির। ভোট জেতার জন্য আজকের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন নেত্রী।

বিধানসভা ভোটে হেরে মন্ত্রিত্বহীন দিন যাপন সহ্য করা সম্ভব নয়। কোনো অজুহাত ছাড়াই আবার নেত্রী ফিরে গেলেন কেন্দ্রের সরকারে আসীন সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে।

আজকে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঙ্গার সরকার চাই না, যারা দাঙ্গা করে তাদের সাথে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বললেও, অতীত কিন্তু অন্য কথা বলে। মানুষের সাথে এই দ্বি-চারিতার জবাব দেবেন মানুষই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্যে—ঢাক ফেঁসে গেছে!

'শিল্প করুন বাংলা গড়ুন'—এই ছিল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, গত ১৬ সেপ্টেম্বর। মিলন মেলায় এলাহি আয়োজন। ছোট মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের মেলার উদ্বোধনে দাবি করলেন যে তাঁর আমলে ২২ হাজারেরও বেশি ছোট বা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এই মেলার পর পাঁচ মাস কেটে গেছে, জেলায় জেলায় অনুরূপ মেলা সংগঠিত করতে ৭৯ লক্ষ টাকার খয়রাতিও করা হয়েছে।

এত কিছুর পরও রুগ্ন ছোট মাঝারি ক্ষুদ্রশিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রায় ৩০০০। কাজ হারিয়েছেন ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মানুষ। অপরদিকে লোকসভা নির্বাচনে, আসানসোল কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীর পরিচয়পত্রে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে যে ঐ নেত্রী নাকি বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। যদিও বন্ধ কারখানা তো খোলেইনি, বরং রুগ্নতা বেড়েছে।

রাজ্য প্রশাসন এসব কথা জানে না, তা হতে পারে না। তাই এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবন নিয়ে নির্বাচনে ঢাক বাজাতে চাইছেন। তা করুন। কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আমলেই গত দু'বছরের চেহারাটা কি! গত ১২ মার্চ রাজ্যের পরিকল্পনা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের একটা তুলনামূলক আলোচনাসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সমীক্ষা রিপোর্ট পরিকল্পনা দপ্তরের হাত ঘুরে পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে। রিপোর্ট জানাচ্ছে—২০১২-তে রাজ্যে রুগ্ন ছোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮৮১৬। ২০১৩-র শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১১৭৩৭। আর এই সময়েই বন্ধ মাঝারি শিল্পের সংখ্যা ২৬৫টি।

একই সাথে 'বিকাশ পুরুষ' হিসাবে যাঁকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় প্রচুর টাকা খরচ করছে কর্পোরেটরা, সেই গুজরাটেও ছোট-ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প লাটে উঠেছে গত দু'বছরে। সামগ্রিকভাবেই গত দু'বছরে সারা দেশেই রুগ্নতা বেড়েছে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে।

বাড়ছে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা

কিন্তু ভোট এসে গেছে। ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে ভোট সংগ্রহ করতে হবে, শ্রমিক মধ্যবিত্তের মধ্যে স্বপ্নের ফানুস না তৈরি করতে পারলে কি করে চলবে। ফলে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে সরকারী অর্থে পাতাজোড়া ঢালাও বিজ্ঞাপন।

কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা রিপোর্ট স্পষ্ট উল্লেখ করেছে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়েছে দ্রুত গতিতে, গত আড়াই বছরে। কতগুলি রুগ্ন, কোনটার কি অবস্থা তা খতিয়ে দেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই রিপোর্টই রাজ্য সরকারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিল্প দপ্তরের আধিকারিকের কথায় 'বড় শিল্পের বিনিয়োগ না এলে ছোট শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না'। বটেই তো। ন্যানোকে তাড়িয়ে দিয়ে ছোট শিল্পকে নিয়ে আসা সম্ভব!

রাজ্য সরকারের তথ্যই বলছে ২০০৭-০৮-এ পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছিল ১৭৬১৮টি সংস্থা। বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৩৫৯৪৬ লক্ষ টাকা। কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৪২ জনের। পরের বছর তৈরি হয়েছিল ১৩৪১৫টি সংস্থা। বিনিয়োগ ছিল ১২৬৪১০ লক্ষ টাকা। কর্মসংস্থান হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৫০ জনের। ২০০৯-১০-এ ১১৬৬৮টি সংস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৯৯৬৫ লক্ষ টাকা। কর্মসংস্থান হয়েছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৬৯ জনের।

বর্তমানে এটা ক্রমাগত কমছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে আর ঢাক বাজিয়ে তা রোধ করা যাচ্ছে না। ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সমস্ত সুযোগের দফারফা। বোঝার উপর শাকের আঁটি—এ রাজ্যের তোলাবাজির ঠেলায় শিল্পের নাভিশ্বাস উঠছে। প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয়ার কোনো হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। উৎসব আর ক্লাবগুলিকে দেদার টাকা বিলি করলে কি শিল্প আসবে! সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না এসব। বেকার যুবক-যুবতী, যাঁরা কর্মসংস্থানের আশায় দিনাতিপাত করছেন তাঁরাও এইসব দেখে তাদের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবেন—সঠিক সময়ে। □

'কয়লামন্ত্রী থাকার সময় নিয়ম ভেঙে দলের কর্মীদের চাকরি দিয়েছিলেন মমতা'

উপরোক্ত শিরোনামটি সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার নিজস্ব অবশ্যই নয়। এমনই শিরোনামে বিগত ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ বর্তমান পত্রিকা, ১৩-র পাতায় সংবাদ করেছে। সেখানে লেখা হয়েছে—''... কেন্দ্রে কয়লামন্ত্রী থাকাকালীন পদকে 'কাজে' লাগিয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত অস্বচ্ছতা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে দিলেন প্রাক্তন কয়লা সচিব পি সি পারেখ। মন্ত্রীর 'ক্ষমতা' কাজে লাগিয়ে নিয়োগ পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ১৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জি এস সিংভি প্রকাশ করেন পারেখের বই 'ক্রুসেডার অর কনস্পিরেটর? ঃ কোলগেট অ্যান্ড আদার ট্রুথ'। সেখানেই কেন্দ্রীয় কয়লা সচিব হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন কয়লামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন পারেখ। উল্লেখ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

‘ভারত নির্মাণ’ বিজ্ঞাপন ও বাস্তবতার ফারাক

‘ভারত নির্মাণের প্রমাণ’ শীর্ষক কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন সবারই চোখে পড়েছে। ঐ বিজ্ঞাপনে এর নিচে আরেকটি বাক্য লেখা থাকতো। বাক্যটি হল ঃ ‘‘মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে যায়, জীবনযাত্রা বদলে দেয়’’। তথ্যের আলোকে দেখা যাক ইউ পি এ সরকারের মেগা প্রোজেক্ট ভারত নির্মাণ দেশের আম জনতার জীবনকে কতটা ছুঁতে পারলো; কতটাই বা পরিবর্তন করা সম্ভব হল তাঁদের জীবনযাত্রা।

- দেশে শ্রমজীবী মানুষের ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্র এবং অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত; যাদের নির্দিষ্ট বেতন নেই, ই এস আই নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, পেনশন নেই—নেই কোনো সামাজিক সুরক্ষা। এক নেই জগতের বাসিন্দা তাঁরা। আর এঁরাই হলেন দেশের কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের মূল কারিগর।
- গ্রামাঞ্চলের ৮০ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৬৪ শতাংশ পরিবার বাঁচার জন্য দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালোরি প্রয়োজন তা জোগাড় করতে পারে না।
- ৫ বছর বা তার কম বয়সী যত শিশু দেশে আছে তার অর্ধেকই রুগ্‌ণ অথবা স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজনের।
- দেশে মহিলাদের ৬০ শতাংশই রক্তাল্পতার শিকার।
- প্রতি বছর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে ভারতে প্রায় ৫৬ হাজার মহিলা মারা যান।
- ২০১২ সালে ৫ বছরের নিচে ১৭ লক্ষ শিশু নিউমোনিয়া ও ডায়েরিয়ার মতো প্রতিরোধ সম্ভব রোগে মারা গেছে। খুব সহজেই এই বিপুল সংখ্যক শিশুকে বাঁচানো যেত।
- জনগণনা অনুযায়ী দেশে ৩৩ কোটি পরিবার আছে। এর ৫৭ শতাংশ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ৫৩ শতাংশের বাড়িতে নেই শৌচালয়।
- স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরও দেশের জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ সাক্ষর হওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই হার চীনে মাত্র ৪.১ শতাংশ, এমনকি ভারতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র দেশ শ্রীলঙ্কায় ৯.১ শতাংশ।
- ২০১৩ সালের হিসেবে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪, এবং মানবোন্নয়ন সূচকে ১৮৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৬।

যতই ‘ভারত নির্মাণ’ শীর্ষক বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বলা হোক ঃ ‘‘মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে যায়, জীবনযাত্রা বদলে দেয়’’; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যই জানাচ্ছে, দেশের আম আদমি যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। উন্নয়নের আলো তাঁদের পর্ণকুটির পর্যন্ত এখনও পৌঁছায় নি। □

উদারনীতির কালো মুখ

- ২০১০ সালে নভেম্বর মাসে মার্কিন সংস্থা ‘গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি’র কালো টাকা সংক্রান্ত গবেষণায় জানা যায় ১৯৪৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট কালো টাকার পরিমাণ ৬৪০০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ১৭৮০০ কোটি ডলার (২৭.৮ শতাংশ) রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে। বাকি ৪৬,২০০ কোটি ডলার (৭২.২ শতাংশ) জমা রয়েছে বিদেশে। অর্থাৎ ২০০৮ সালের টাকার মূল্যে হয় প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা।
- ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৩ বছরে যত কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে সেই সমপরিমাণ টাকা ১৯৯১-২০০৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮ বছরে পাচার হয়েছে বিদেশে।
- আবার উদারনীতির সময়কালে যত কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে তার ৬৭ শতাংশই গেছে ২০০০-২০০৮ সালের মধ্যে।
- ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট কালো টাকার পরিমাণে ভারতের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.২ শতাংশ।
- অর্থাৎ কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের আমলে উদারীকরণ ও সংস্কার কর্মসূচী যত দ্রুততার সাথে হয়েছে তত দ্রুতই বিদেশে কালো টাকা পাচার হয়েছে।
- এই বিপুলায়তন কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করে ভারত যদি দেশে ফিরিয়ে আনতে পারত তাহলে তার অর্ধেক দিয়ে সমস্ত বিদেশী ঋণ শোধ করে নিতে পারত। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে অনায়াসে দারিদ্র-দূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সফলভাবে রূপায়ন করা যেত। □

২০ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা অবৈধ পথে দেশ থেকে বেপাত্তা

১৯৪৮-২০১০—এই ৬৩ বছরে দেশের ২০ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে চালান হয়েছে। ২০১১ সালে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন কর ফাঁকি, ঘুষ, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই এই বিশাল পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে গেছে। এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে বহির্গমন ঘটেছে ১৯৪৮ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে অর্থাৎ ৬০ বছরে। আর ১১ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকার বহির্গমন ঘটেছে ২০০৮-২০১০—দু’বছরে। এখনও পর্যন্ত এই টাকা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি; উল্টে ইউ পি এ সরকার এই অপরাধীদের নাম গোপন রাখা ও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। এন ডি এ-ও তাদের আমলে এই টাকা ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করেনি। বরং এন ডি এ আমলেই দেখা গেছে যে, ঐ তথাকথিত দ্বৈতকরকে কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় তার জন্য অত্যন্ত জঘন্য উপায় বার করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে কর ফাঁকিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং টাকা হাতানোর সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে।

এই ২০ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা ২০১৪-১৫ সালের বাজেটের পরিকল্পনা বহির্ভূত বরাদ্দের সমান। বাজেটের পরিকল্পনার বহির্ভূত বরাদ্দ দিয়ে সরকারের সমস্ত কল্যাণমূলক কাজকর্ম ও এই সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি এবং সরকারী কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

২০ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ এবং অন্যান্য দেশের কাছে ভারতের মোট যে ঋণ আছে তার দ্বিগুণের সমান। ২০ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা জনকল্যাণে ব্যবহার করা হলে বর্ধিত বরাদ্দের ছবিটা হতো অনেকটা এরকম—

(ক) শিক্ষায় ১৪ গুণেরও বেশি বরাদ্দ হত;

(খ) স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেত ৩১ গুণেরও বেশি;

(গ) দলিত, আদিবাসী এবং সমাজে অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া মানুষের কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেত ১৪ গুণেরও বেশি;

(ঘ) সবার খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেত, দেশ থেকে ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে দূর হতো;

(ঙ) বিদ্যুৎ মাশুল হ্রাস সহ সর্বজনীন বিদ্যুৎ সংযোগ সুনিশ্চিত করা যেত। এমনকি দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হতো।

(চ) নতুন অনেক শিল্প স্থাপন করা যেত, যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো।

এইসব ভালো ভালো কাজ করনো যেতই। কিন্তু করতে হলে যাঁদের রেস্তরয় হাত পড়বে, তাঁদের চটানোর সাহস মসি-নম-রাগা-মম কারোরই নেই যে!! □

নব্য একুশে আইন

মা দুর্গার আপন পাটে,
(সৌজন্যে আর এস এস)
আইন কানুন উঠল লাটে!
কেউ যদি কভু প্রশ্ন করে
(সৌজন্যে শিলাদিত্য)
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
অন দ্য স্পট হয় বিচার—
‘মাও-ফাও’ তক্‌মা তার!!

সেথায় সন্ধে ছ’টার পরে
হাঁটতে হ’লে (মহিলাদের) শঙ্কা লাগে,
হাঁটলে পরে বে-খেয়ালে—
আদিম-রিপু ঝাঁপিয়ে পড়ে,
পুলিশ নাকে নস্যি নেয়—
‘দুষ্টু-দামাল’ খোস মেজাজে নিদ্রা যায়।।

নেট-কার্টুন পোষ্ট করলে
(সৌজন্যে অম্বরিশ মহাপাত্র)
রাজ্যটা যায় রসাতলে
কোটাল এসে ধমক মারে—
কলার চেপে পাঠায় জেলে।।

ছাত্র-ছাত্রী পড়তে চায়,
স্বপ্ন চোখে কলেজ যায়,
হেথায় দ্যাখে দাদাগিরি,
আট-পাশেদের খবরদারি,
মাস্টারনি করলে রাগ—
কপাল ফাটায় জলের জাগ।।

মিছিল হাঁটে ভাই সুদীপ্ত,
ছাত্র-যুব ভীষণ ক্ষিপ্ত,
রানীর কাছে খবর ছোটে
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
টেনে তাদের ভ্যানে তোলে—
পিটিয়ে পথে লাশ ফ্যালে।। (ছিঃ)

যে-সব লোকে দাবি করে, (কর্মচারী)
তাদের ধরে বদলি করে,
ধর্মঘট শুনলে পরে,
কাগজ ছাপে সার্কুলারে,
বেতন কাটা, ডাইস-নন্‌—
রানীর কেমন উদারমন??

কেমন দ্যাখো কেরামতি,
ধর্ম ও জিরাফ দুই-ই সাথী,
সকাল কাটে ‘হাত’-এর সনে,
রাত গোপনে ‘পদ্ম’বনে,
মা-মাটি সব ‘অ্যান্টিক’ ভাই—
দিল্লি থেকে লাড্ডু চাই।।

(বরেণ্য শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহ

সুমিত ভট্টাচার্য

বিনা মন্তব্যে

*** নির্বাচন বিধি ভাঙার অভিযোগ**
বিশ্ব ব্যাংকের টাকায় তৃণমূল নেতাদের সুন্দরবনে “আমোদ ভ্রমণ”

বনদপ্তরকে দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় পূর্বমেদিনীপুরের ২১ জন পদাধিকারী তৃণমূল নেতার দুদিনের সুন্দরবনে ‘প্রমোদ ভ্রমণ’ নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পরও সরকারি খরচে পদাধিকারীরা এ ধরনের কোনও ভ্রমণে যেতে পারেন না। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠছে, কোন প্রক্রিয়ায় সেই আচরণ বিধিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পদাধিকারীরা এ কাজ করলেন? এক্ষেত্রে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসের, বাসন্তীর সোনাখালি থেকে লঞ্চে সুন্দরবনে দুদিন ধরে ঘোরা এবং খাওয়াদাওয়ার এলাহি খরচ বহন করেছে বন দপ্তর।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাকে প্রাকৃতিক বিপর্যেয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোনাল ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে বারোশো কোটি টাকা দিয়েছে. উপকূলবর্তী এলাকায় ম্যানেগোরাভ জঙ্গল বাড়ানো এবং সামাজিক বনসৃজন এর মূল উদ্দেশ্য।

ওই প্রমোদভ্রমণে জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, দুজন বিট অফিসার প্রবীর সেন ও গৌরীশংকর দাস সহ মোট ২১ জন গিয়েছেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের সভাধিপতি মুধরিমা মণ্ডল স্বাক্ষর করেছেন। সুন্দরবন নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন করেছে বন দপ্তর। তাঁর কথায় ওই ভ্রমণে আমার এবং সহ সভাপতি শেখ সুফিয়ানের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও জেলায় নির্বাচন সংক্রান্ত চাপ এসে পড়ায় যাইনি। তিনি বলেন, এর যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ।

[বর্তমান, ৯ ই মার্চ, ২০১৪]

*** মমতার যাত্রাপথ সাফে রাজকীয় আয়োজন**
পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা পরিষ্কারে ১০০ জনের বাহিনী, মাসিক খরচ পাঁচ লক্ষ

তিনটি রাস্তা মিলিয়ে দৈর্ঘ্য মেরেকেটে পাঁচ কিলোমিটার। তা সাফসুতরো রাখতে নিযুক্ত ১০০ জনের পৃথক কর্মী বাহিনী। তারা ঠিকমত কাজ করছেন কি না, সে নজরদারিতে সর্বক্ষণের দায়িত্বে পুরসভার দু-দুজন ইঞ্জিনিয়ার, শশব্যস্ত একাধিক পুর অফিসারও। কর্মীদের পারিশ্রমিক এবং পথ সারাইয়ের সরঞ্জামের মূল্য ধরলে মাসিক খরচ পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী। এ নিয়েই এখন পুর-মহলে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। কেননা, এ পথ দিয়ে প্রায় রোজই যাতায়াত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতেই কি পুরসভার এই রাজকীয় আয়োজন? টাকার অভাবে যখন দৈনন্দিন পরিষেবা দিতে পুরসভা হিমসিম খাচ্ছে, বিদ্যুৎ বিলের টাকা মেটানো যাচ্ছে না, তখন এভাবে অর্থ খরচের যৌক্তিকতা কতটা?

পুরসভা সূত্রে খবর। দক্ষিণ কলকাতার বেলভেডিয়ার রোড, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর রোড, এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির পার্শ্ববর্তী এলাকা বছর ভর ঝাঁ-চকচকে রাখতে সম্প্রতি ফরমাস জারি করেছেন পুর-কমিশনার খলিল আহমেদ। এপথ ধরেই কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্নে যাতায়াত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এইসব রাস্তা এবং তার আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রায় ১০০ জন মহিলা কর্মীকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সদ্য নিয়োগ করা হয়েছে।

[এইসময়, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪]

*** ত্রিফলার ফাঁদে চড়ছে বিল, বর্ধিত মাসুল গুণতে হতে পারে আম আদমিকে**
বিদ্যুৎ ৪০০ কোটি বকেয়ার ফাঁসে পুরসভা

৪০০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখে রেকর্ড গড়ল কলকাতা পুরসভা। নাগরিকের কাছ থেকে বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ে যে পুর কর্তৃপক্ষ খড়্গহস্ত, নিজেদের বিদ্যুৎ বিল মেটানোর বেলায় তাঁদের কোন হেলদোল নেই। সি ই এস সি নিয়ম করে মাসের শেষে বিদ্যুৎ বিল পাঠিয়ে দিলেও গত ১৪ মাস ধরে টাকা মেটানোর নামগন্ধই করছে না পুরসভা। বকেয়া টাকা চেয়ে কয়েকদিন আগেই মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি পর্যন্ত দিয়েছেন ওই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাতে লাইন কাটার কথা না বললেও, বলা হয়েছে পুরসভা বকেয়া টাকা না মেটালে শহরের ২৮ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে। পুরসভা বকেয়া না মেটানোয় সংস্থার যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে তা তারা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি অথরিটিকে জানাবে যাতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া যায়। আগে যেখানে পুরসভার মাসে ৮-১০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল হত, এখন সেটা বেড়ে প্রায় ৩০ কোটি ছুঁই ছুঁই। লাইটিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা জানাচ্ছেন, গত তিন বছরে শহরে কয়েক হাজার ত্রিফলা আলো বসেছে। পার্ক ও জলাশয়ের ধারেও নতুন আলো লাগানো হয়েছে। পুরসভার অফিসগুলিতে এসি-র ব্যবহারও বেড়েছে। তার জেরেই বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

[এইসময়, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪]

*** কমিশনেই বছরে পাঁচ কোটি ‘গচ্চা’ সরকারের**

বিভিন্ন ঘটনায় সুবিচার দিতে ১১টি কমিশন করেছে রাজ্য সরকার। আর সেই সব কমিশন থেকেই বছরে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এখানেই থেমে থাকছে না খরচের অঙ্কটা। আগামী অর্থ বছরে এই খাতে কমপক্ষে খরচ আরও ৮০ লক্ষ টাকা বাড়বে। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতেই এই খরচের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে শ্যামল সেন কমিশনেই বছরে খরচ হচ্ছে এ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১১টির জায়গায় ৮টি কমিশন খাতে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্যামল সেন কমিশন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। তবে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের আশঙ্কা, সরকার যদি বছরের মধ্যে আরও কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এই খাতে ব্যয় আরও বাড়বে।

[এইসময়, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪]

মিত্র হোক সংগ্রামী হাতিয়ার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কাজ অনেকটাই সহজ ছিল। তবুও তার মধ্যেও প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও আমলাতন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠন তীব্র আন্দোলন সংগ্রাম জারি রেখেছিল ধারাবাহিকভাবেই। এই চিত্র ফুটে উঠেছে সেই সময়ের পত্রিকায়। কর্মচারীদের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির খবর প্রায় প্রতিটি সংখ্যার পত্রিকাতেই মুদ্রিত রয়েছে। রয়েছে সহযোগিতার কর্মসূচী, সামাজিক কর্মসূচীর খবর। এই সময়ে অনুকূল পরিবেশে কর্মচারী আন্দোলন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে তার পরিধির অনেকটাই ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিল। এই ব্যাপ্তি সংগঠনের নীতিগত অবস্থানকে অবিচল রেখেই ঘটানো হয়েছিল। তুলনায় সমগ্র সময়কালের প্রথম ভাগ ও তৃতীয় ভাগ হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষার সময়।

তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, সংগঠনকে যেমন প্রতিকূল সময়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তেমনই তার মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারও সময়ের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিল করেই প্রকাশিত হয়। সেই মতনই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করার অদম্য জেদ ফুটে উঠছে এই সময়ের সংগ্রামী হাতিয়ারে। যেমনটি ফুটে উঠেছিল ১৯৭১-১৯৭৭-এর সময়কালে। এই দুই সময়কালের পত্রিকার পাতা ওল্টালেই সামঞ্জস্যপূর্ণ অকুতোভয় মানসিকতা বজায় রাখার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাবে। লক্ষ্য করা যাবে শাসক শ্রেণীর সংগঠনকে আক্রমণ করার চারিত্রিক সাদৃশ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (৭ মে, ১৯৭১)- তে 'বর্বর আক্রমণ' শিরোনামের সংবাদের কথা। সেখানে লেখা হয়েছে—''...কুচবিহার জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অফিস রাতের অন্ধকারে গুণ্ডারা আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে অফিসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে।... বহু অঞ্চলে কর্মীদের শাসনো হচ্ছে।... বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী নকশালী গুণ্ডাদের হুমকিতে এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারেন নি।'' এই প্রতিবেদনে শাসকশ্রেণীর আক্রমণে নিহত সংগঠনের ১১ জন নেতা-কর্মী ও আহত ১৮ জনের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ বছরের ২য় সংখ্যায় (৮ জুন, ১৯৭১) শিরোনাম ''আরও খুন আরও আক্রমণ আরও গ্রেপ্তার''। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (জুলাই ১৯৭১)-র শিরোনাম 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বীকৃতিহরণের অপচেষ্টা আপাতত ব্যর্থ''। ১ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যার (সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) শিরোনাম ''রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ বরখাস্ত ঃ প্রতিরোধের সমুদ্র-গর্জন / প্রশাসন স্তব্ধ ঃ জনগণের রুদ্ররোশের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ঃ সারা ভারত প্রতিবাদ মুখর''।

অর্থাৎ একদিকে যেমন সন্ত্রাস চরম পর্যায়ে, অন্যদিকে সেই সন্ত্রাস মোকাবিলায় জনগণকে সাথে নিয়ে কর্মচারীদের প্রতিরোধের সংগ্রাম। শত আক্রমণের মুখেও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসে নি সংগঠন ও কর্মচারী সমাজ। তার উদাহরণ পাওয়া যায় সেই সময়ের সংগ্রামী হাতিয়ারে। ১ম বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)-এ মুদ্রিত হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঘোষণা—''সর্বশক্তি দিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান।'' রাজ্যের সেই সময়ে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান দিয়েছিল সংগঠন। সেই আহ্বানে ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও কর্মচারী সমাজের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় (নভেম্বর, ১৯৭১) প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের জন্য মাত্র দু-দিনের মধ্যে তহবিল সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত, তিন লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত।

বর্তমান সময়ে (তৃতীয় ভাগে) যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ''অফিসে, সংগঠন দপ্তরে, সরকারী আবাসনে হামলা চলছেই'', ''ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাকরণ ক্যান্টিন হল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ'' (৪০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১১) ''আগামী তিন মাসে মহার্ঘভাতার কোনো সম্ভাবনা নেই'' (৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আগস্ট ২০১১)। আক্রমণের পাশাপাশি সংগ্রামও জারি—''২২ নভেম্বর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে সুবিশাল সমাবেশ থেকে লড়াই জারির ঘোষণা'' (৪০ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১১)। আক্রমণ উত্তরোত্তর যত বৃদ্ধি পাচ্ছে সংগ্রামও ততই শক্তিশালী হচ্ছে। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচীর খবর, যার মধ্য দিয়ে জনগণের সাথে কর্মচারীর মেলবন্ধন ঘটানোর সংগঠনগত যে পরম্পরা তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

এছাড়াও সংগ্রামী হাতিয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে কর্মচারীরা যাতে শুধু দাবিদাওয়া আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ না রাখে। ফলাফলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়েও বেশি জরুরী কারণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাই সংগঠনের নেতা-কর্মী তথা সমগ্র কর্মচারী সমাজকে পরিস্থিতি সচেতন করার কাজ ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। অনুগামীদের পরিস্থিতি সচেতন করতে গেলে সমাজ সচেতনতা তৈরি করতে হয়। সেই প্রয়াসও জারি রেখেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। বিভেদকামী, বিরোধীদের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকা সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

রাজ্যে তথাকথিত পরিবর্তনের পর সংগঠনের উপর যেমন আক্রমণ এসেছে, তেমনই আক্রমণ নেমে এসেছে সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের উপরও। সেই খবর বিগত তিন বছরের সংগ্রামী হাতিয়ারের পাতা ওল্টালেই নজরে পড়বে। শত আক্রমণেও সংগ্রামী হাতিয়ার ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। এই আক্রমণ এখনও চলছে। শুধু বিরোধী কর্মচারী সংগঠন দ্বারা নয়, মুখপত্রের উপর আক্রমণ নেমে আসছে শাসকদল কর্তৃক। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সাহসের সাথে তা সামলাচ্ছেন। কারণ তাঁরা জানেন যে শাসকশ্রেণী শ্রমিক কর্মচারীদের মগজে শান দেওয়ার যে কোনো অস্ত্রকেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে এবং নিশ্চিহ্ন করে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এ রাজ্যে অধুনা শাসক দল যখন বিরোধী দল ছিল সেই সময় রাজ্যের বেশ কয়েকটি পাঠাগার ধ্বংস করেছিল ওরা। একই কারণে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সংগ্রামী হাতিয়ারও।

আসন্ন ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের বিগত সময়ের অভিজ্ঞতাকে একটু ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করার কাজ করছে অকুতোভয় সংগ্রামী হাতিয়ার। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচন কর্মী হিসাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করার কাজ অবশ্যই করবেন। আবার তাঁরাই পরিবার পরিজন সহ ভোটাধিকারও প্রয়োগ করবেন। অনুগামীদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভোট প্রদানের কথা বলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। রাজ্যবাসী তথা দেশবাসী হিসাবে কর্মচারীদের বিগত সময়কালের কিছু অভিজ্ঞতা তথ্য সহ তুলে ধরা হচ্ছে পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলিতে। একইভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হচ্ছে। মুখপত্রের ইতিহাস বলছে এই কাজ সততার সাথে ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। ১৯৭২ সালে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় সংগ্রামী হাতিয়ার (১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছিল—''জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আন্দোলন লব্ধ চেতনার উপর দাঁড়িয়ে আসন্ন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন/ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বান''। তাতে লেখা হয়েছিল, ''...গত ৫ ফেব্রুয়ারী '৭২ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত অধিবেশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই নির্বাচনকে তাই নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা, রুটি-রুজি, গণতান্ত্রিক অধিকার তথা অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি রাজ্য সরকারী কর্মচারীর নিকট আহ্বান জানিয়েছে।'' বর্তমানে নির্বাচন আলাদা, প্রেক্ষিত আলাদা, কিন্তু কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান একই আছে। মূল লক্ষ্যে এভাবেই সবক্ষেত্রে অবিচল থেকেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। এই কারণেই কর্মচারীদের কাছে এই পত্রিকা এত প্রিয়।

সংগ্রামী হাতিয়ার প্রকাশনা থেকে প্রতিটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই কাজটি সম্পূর্ণতা লাভ করে সাংগঠনিক তৎপরতা, প্রকাশনা ও পত্রিকা বিতরণের কাজে যুক্ত কেন্দ্রীয় স্তর ও জেলা স্তরের সংগঠক, কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা। এটি একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের কোনো একটি বিন্দুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া মানেই সামগ্রিক প্রয়াসটি ব্যহত হওয়া। এই বিষয়ে আমাদের সংগঠক, কর্মীরা দারুণভাবে সজাগ। বর্তমানে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশনার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত তাঁদের এই ধরনের আক্রমণের মুখে অতীতে কখনোই পড়তে হয়নি। সহজ এবং অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁরা কাজ করে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতিতেও অনেক বাধা ডিঙিয়ে যে সাহসিকতার সাথে বিশেষ করে কর্মচারীদের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি কমরেডরা করছেন, সেই প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে। আক্রমণ আরও বৃদ্ধি পাবে। শাসকশ্রেণী শ্রমিক কর্মচারীর চেতনাকে ভয় পায়। তাই চেতনা বৃদ্ধির হাতিয়ার মুখপত্রকে ওরা আক্রমণ বর্তমানে কোথাও কোথাও মুখপত্রের গ্রাহক না হওয়ার ফতোয়াও দেওয়া হচ্ছে। এই প্রতিকূলতাকে ভেদ করেই চলছে সংগ্রামী হাতিয়ারের ৪২তম বর্ষের গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচী। জেলায়, মহকুমায়, ব্লকে, অঞ্চলে, সেক্টরে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করার সংগ্রামের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে একে গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি কর্মচারীকে এই পত্রিকার গ্রাহক করার চ্যালেঞ্জ নিয়েই এই কর্মসূচী সফল করতে হবে। গত বছরের তুলনায় গ্রাহক বৃদ্ধির সুস্থ প্রতিযোগিতা জারি থাকুক সংগঠনের সর্বস্তরে। এর পরের কাজ হবে গ্রাহককে পাঠকে পরিণত করা। সংগঠনের ঐতিহ্য, পরম্পরার উপর ভরসা রেখে বলা যায় সর্বস্তরের সংগঠক কর্মীদের এই সম্মিলিত উদ্যোগ সফল হবেই। □

মানস কুমার বড়ুয়া

দলের কর্মীদের চাকরি দিয়েছিলেন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

এন ডি এ জমানায় ২০০৪ সালের ২০ মে থেকে চার মাস কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত বইয়ের ৮৭ থেকে ৯১ পাতায় ১১ অনুচ্ছেদে 'মাই ফার্স্ট মিনিস্টার মিস মমতা ব্যানার্জী দ্য আদার সাইড অব সিমপ্লিসিটি' শীর্ষক অধ্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য করে বর্তমান পত্রিকা লিখেছে—''... কিন্তু তিনি তাঁর দলের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করার লোভ ত্যাগ করতে পারেননি। তাই কয়লামন্ত্রীর চেয়ারে বসেই কোল ইন্ডিয়ার সি এম ডি শশী কুমারকে ৫০ জনের মতো তৃণমূল কর্মীকে ট্রেনি হিসাবে নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডের কয়লাখনিতে তাদের নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ দেওয়ার কথা বলা হয় উল্লেখ করে প্রাক্তন কয়লা সচিব লিখেছেন, নিয়োগের জন্য সরকারি কোনো নিয়োগ পদ্ধতি মানা হল না। দেওয়া হল না বিজ্ঞাপন। কোনো পরীক্ষা বা ইন্টারভিউও নেওয়া হল না। শশীকুমারকে নামের একটি তালিকা ধরিয়ে দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডার জারির নির্দেশ দিলেন মমতা।'' ঠিক এই ধরনেরই অভিযোগ রাজ্যের সাম্প্রতিক নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও শাসকদলের বিরুদ্ধে উঠেছে।

ঐ বইতে পি সি পারেখ আরও বলেছেন—''... নিয়োগ হওয়া তৃণমূল কর্মীরা কাজ করত না। কেবল অ্যাটেনডেন্স দিয়েই চলে যেত। দলের হয়ে কাজ করত। প্রাক্তন কয়লা সচিবের বক্তব্য, সে সময়ে কোল ইন্ডিয়াতে প্রচুর বাড়তি কর্মী হয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়োগ বন্ধ তো বটেই, স্বেচ্ছাবসর নীতি চালু হয়েছিল। কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রকে ক্ষমতার ব্যবহার করে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে দলীয় কর্মীদের নিয়োগ করেছিলেন বলেই বইয়ের ৮৯ পাতায় লিখেছেন পারেখ। শুধু ঐ কর্মী নিয়োগই নয়, কয়লামন্ত্রকের অধীন এন এল সি অর্থাৎ নেভিলি লিগনাইট কর্পোরেশনের ডিরেক্টর পদেও তৃণমূলের অযোগ্য কর্মীদের মমতা বসান বলেও বইতে লেখা হয়েছে। আগের সম্মানীয় ডিরেক্টরদের কয়েকজনকে সরিয়ে তৃণমূলীদের নিয়োগ করা হয় বলেও লিখেছেন পারেখ সাহেব।'' (সূত্র ঃ ঐ) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বোর্ডের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় কোল ইন্ডিয়ার একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেছেন পারেখ। পি সি পারেখ ঐ বইয়ে আরও লিখেছেন—''হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তরের জন্য কলকাতা পুরসভাকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য কোল ইন্ডিয়ার সি এম ডি কে চাপ দেন মমতা। কোল ইন্ডিয়া খনি সংক্রান্ত কোম্পানি, তাদের এরকম হাসপাতাল গড়ার কোনো প্রকল্প হয় না। তাছাড়া কোম্পানির কর্মীদের চিকিৎসার যুক্তিতে যদি হাসপাতাল করতেই হয়, তাহলে তা ঝাড়খণ্ডে করা উচিত। সেখানে কোল ইন্ডিয়ার ৫০ শতাংশ কর্মী রয়েছে। কলকাতায় তা মাত্র ০.২৫ শতাংশ। কিন্তু এসব 'যুক্তি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানতেই চাননি শুধু নয়, তাঁর পছন্দের এন জি ও-দের ডোনেশন দেওয়ার জন্যও কোল ইন্ডিয়ার সি এম ডি-কে চাপ দেওয়া হয় বলে বলেছেন প্রাক্তন কয়লা সচিব''। (সূত্র ঃ ঐ) — মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রাক্তন কয়লা সচিবের এই লিখিত মন্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা রুজু করার কোনো সংবাদ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। □

মানস কুমার বড়ুয়া

সমিতি সম্মেলন

গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ মালদা শহরের (চুনীলাল চক্রবর্তী নগর) সানাউল্লাহ মঞ্চে (বিধূরঞ্জন চক্রবর্তী মঞ্চ) সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলো **ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের** ৩২তম রাজ্য সম্মেলন। মিছিল সহকারে শহর পরিক্রমার পর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনীল সেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর চক্রবর্তী। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ মিশ্র। খসড়া প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন যথাক্রমে শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, নাথুন ব্যানার্জী, আবদুল মালেক, মিহির জানা, অমিত বোস ও কমল দে। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন তাপস সাহা, অসিত বরণ দাস, গুণধর মাইতি, নব্যেন্দু ভট্টাচার্য ও শিখা চৌধুরী। ৩০ জন প্রতিনিধির আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার দাস।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অভিনন্দনসূচক বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রমাপদ চট্টোপাধ্যায়, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুবীর রায় এবং প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অভিজিত দেব। সম্মেলন থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, সকলের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রসার, শূন্যপদ পূরণ, হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করা, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা প্রদান, বেতন কমিশনের বকেয়া সুপারিশ কার্যকরী করা, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধে এবং নারী নির্যাতন রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি দাবি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে নির্মল দাসকে সভাপতি, গুণধর মাইতি ও বিমল চক্রবর্তীকে সহ-সভাপতি, অশোক কুমার দাসকে সাধারণ সম্পাদক, শিবপ্রসাদ বিশ্বাস ও প্রবীর চক্রবর্তীকে যুগ্ম সম্পাদক, অসিত বোস, অসিত বরণ দাস ও মিহির জানাকে সংগঠন সম্পাদক, নারায়ণ মিশ্রকে কোষাধ্যক্ষ ও তাপস কুমার সাহাকে দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনে ১৫৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন নির্মল দাস, অরুণ ভৌমিক ও শিখা চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।□

নিরঞ্জন প্রামানিক

মার্কিন দেশের প্রকৃত চিত্র

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস-বিজেপির নয়নের মণি, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা উপরের দুটি ছবি থেকে স্পষ্ট। একদিকে কাজ হারিয়ে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করছেন অপরদিকে বিক্ষোভে রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠছে।

কর্মচারী, শিক্ষক-সমাজের অবস্থা

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

আমন্ত্রিত হয়ে রাজ্য থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী সাংসদরাও ছিলেন। কিন্তু সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে 'বামফ্রন্টের সাথে কোনও সহযোগিতা নয়' এই বক্তব্য বলে সভা ছেড়ে কংগ্রেসী সাংসদরা বেরিয়ে যান। সাংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী এর নেতৃত্বে ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০০ সাল ভয়াবহ বিধ্বংসী বন্যায় যখন রাজ্যের অর্ধেকের বেশি মানুষ আক্রান্ত, রাজ্যকে সাহায্যের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সদ্য ইস্তফা প্রদানকারী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী সাংসদ, মন্ত্রীরা যখন দিল্লীতে অবস্থান করছেন, তখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসাবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে বামফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন।

প্রতি পাঁচ বছর অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনের ফর্মূলা নির্ধারণে অর্থ কমিশন গঠিত হয়। বর্তমানে চতুর্দশ অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে। একাদশ অর্থ কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৮-৯৯ সালে। এই কমিশনের নিকট পেশ করা স্মারকলিপিতে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, "সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনক্রম ইতোমধ্যেই রাজ্য সরকার সংশোধন করেছে। এর জন্য বছরে অতিরিক্ত ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আমরা আশা করি যে, রাজ্য অর্থনীতির উপর এই সুপারিশ প্রয়োগের ফলাফল অনুধাবন করে অর্থ কমিশন পর্যাপ্ত অর্থ— অন্তত অতিরিক্ত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে রাজ্যকে প্রদান করবে।" অর্থ কমিশনের নিকট প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে ১৫টি দাবি পেশ করেছিলেন, তার অন্যতম দাবি ছিল এই প্রসঙ্গটি। এই ভাষণে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, "রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের বেতন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৫০ শতাংশের দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হবে। এর জন্য অন্তত পক্ষে রাজ্যের থেকে ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এবং/অথবা কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ওয়েজ অ্যান্ড মীনস (wage and means) খাতে অনুদান নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।"

বলাই বাহুল্য অর্থ কমিশন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বোক্ত দাবিকে উপেক্ষা করেই এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে যে, "রাজ্য সরকারগুলির উচিত তাদের রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধন করা। কোনও কোনও রাজ্য তাদের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের থেকেও উন্নত বেতনক্রম চালু করেছে, যা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয়নি। ....কেন্দ্র/রাজ্য আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সংশ্লিষ্ট সরকারগুলিকে তাদের কর্মচারীদের জন্য বেতনভাতার পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে।" (পৃঃ ২৭, অধ্যায় ৩.৫৭)।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই সুপারিশের কার্যকাল ছিল ২০০০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই সুপারিশ যে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে সেই এন ডি এ সরকারের প্রথমে কয়লা মন্ত্রী ও পরে রেলমন্ত্রী ছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন তিনি মন্ত্রিসভায় থেকেও এই সুপারিশের বিরোধিতা করেননি। অর্থাৎ 'ক্ষমতা অনুযায়ী বেতন দাও' এই বক্তব্যকে তিনি যখন মেনে নিয়েছেন, তাহলে এখন কেন এই দায় কেন্দ্রীয় সরকার বা অর্থ কমিশনে উপর চাপানো হচ্ছে? দ্বিতীয়ত বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস দাবি করেছে এবং রাজ্য কর্মচারীদের বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থের ৫০ শতাংশ দায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণের দাবি করেছে। এমনকি মূল্যবৃদ্ধির পরিণতিতে যেহেতু মহার্ঘভাতা পাওনা হয় এবং মূল্যবৃদ্ধির জন্য যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিই দায়ী, তাই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার দায় অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু এযাবৎকাল বামপন্থীদের এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনের এই দাবিকে কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস তুমুল বিরোধিতা করে এসেছে। অথচ এখন সরকারে গিয়ে মহার্ঘভাতার ন্যায্য পাওনা না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তার দায় চাপিয়ে দেওয়াকে নিছক সুবিধাবাদ এবং কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি?

তা ছাড়া এই প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের সাথে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অবস্থানগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বামফ্রন্ট সরকার বেতনভাতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বারে বারে দাবি পেশ করেছে ঠিকই, কিন্তু একে অজুহাত করে মহার্ঘভাতার দাবিকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় যখন ছিল না তখন নিঃশর্তভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ক্ষমতায় গিয়ে তা বেমালুম অস্বীকার করে এক নিকৃষ্ট ধরনের সুবিধাবাদকে আশ্রয় করেছে। উভয় সরকারের মধ্যে এই পার্থক্য এখন রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বোর্ড কর্পোরেশন ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত ও তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে স্পষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী ও রাজ্য মন্ত্রীদের বেতন একলাফে দেড়গুণ হয়ে গেছে। এখন মন্ত্রীরা দপ্তরের চৌকাঠ পেরোলেই দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতা পাবেন। কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের ঘর সাজানোর পর আবার কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করে সচিবালয়কে রাইটার্স থেকে হাওড়ার এইচ আর বি সি ভবনে নিয়ে যাওয়া, সরকারী ভবনগুলিকে অকারণে নীল-সাদা রঙে সজ্জিত করা, দলীয় বুদ্ধিজীবী, খেলোয়াড়দের লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য হরেক রকমের পুরস্কার ঘোষণা, বিভিন্ন ক্লাবকে বাৎসরিক অনুদানের ব্যবস্থা করা, বছরে ৬০টি উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা প্রভৃতির জন্য টাকার অভাব হয় না বা এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রসঙ্গও আসে না; শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের প্রশ্নেই অর্থাভাব দেখা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাড়া বা ২৭ মাসের বকেয়া প্রদানের বিষয়টি তো মুখ্যমন্ত্রী একেবারে বেমালুম ভুলে গেছেন। আসলে ক্ষমতায় আসার জন্য মিথ্যাচারই যে তৃণমূল কংগ্রেস দলটির একমাত্র পুঁজি তা অভিজ্ঞতা দিয়ে কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজ হারে হাড়ে বুঝতে পারছেন।

তিন

পঞ্চম বেতন কমিশনের সাতাশ মাসের বকেয়া, মহার্ঘভাতার বকেয়া কিস্তি প্রদান, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাড়া প্রদান প্রভৃতি দূর অস্ত্। এ সরকার যতদিন থাকবে, ততদিন তা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই তা এখন রাজ্যবাসী মর্মে মর্মে বুঝছেন।

কিন্তু রাজ্য সরকার খেতে দিতে পারে না, কিল মারার গোঁসাই। বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া, তা দিতে না পারার জন্য সরকারের বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ নেই। উল্টে মহার্ঘভাতা চাইবার অধিকারটাই এখন হরণ করতে উদ্যত এই সরকার। রাজ্য সরকারের সচিবালয় সহ বিভিন্ন অফিসে টিফিন বিরতির সময় পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পোস্টারিং, স্কোয়াড, সাধারণ সভা করার অধিকার নেই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি সংগঠন-আন্দোলন করার অধিকারও আজ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৮০ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংবলিত নতুন আচরণবিধি প্রণয়ন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট কুখ্যাত কন্ডাক্ট-রুলস বাতিল হয়ে যায়। ধর্মঘটের এই অধিকারকে বিগত ৩৪ বছর রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই অধিকারকে অস্বীকার করে ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২০১৩ সালের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশগ্রহণের কারণে রাজ্য কর্মচারীদের বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে, ছুটি মঞ্জুর করা হয়নি এবং সর্বোপরি 'ডায়াস নন্' এর মাধ্যমে সমগ্র চাকরিকাল থেকে ধর্মঘটের দিনগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছে; কিন্তু কোথাও 'ডায়াস নন'-এর ন্যায় কালাবিধি ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য হয়নি। এর পাশাপাশি চলছে বেছে বেছে সংগঠক কর্মীদের দূর-দূরান্তে বদলি, বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক হয়রানি প্রভৃতি। এই প্রশাসনিক সন্ত্রাসের শিকার হতে হচ্ছে এমনকি মহিলা কর্মচারীদের, প্রতিবন্ধী কর্মচারীদের, এমনকি অবসরের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া কর্মচারীদেরও।

বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে বা সরকারী কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের উপর সমাজবিরোধীদের হামলা চলছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মচারীদের কাছ থেকে জোর করে তোলা আদায় করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের কর্মচারী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী প্রভৃতিদের উপর এই অত্যাচার বেশি করে সংগঠিত হচ্ছে।

রাজ্য কর্মচারীদের দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া বা বিভাগীয় সমস্যাবলী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় বা সচিবদের পত্র দিলে তার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয় না, দেখাসাক্ষাৎ তো দূরের কথা। এক শ্রেণীর আধিকারিকের আচার-আচরণ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের ন্যায়। এরা সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধিকে তোয়াক্কা না করেই এইসব আচরণ করে চলেছেন।

একদিকে মহার্ঘভাতাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার চূড়ান্ত অস্বীকৃতি, অন্যদিকে স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের উপর আক্রমণ—এই উভয় দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজ আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ভেঙে দেওয়ার হুমকি। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগামী ফেডারেশনের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে জোড়া লাগানোর সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন "কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দিন" মুখ্যমন্ত্রীর এই হুমকিকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি টিফিন বিরতির সময় কর্মচারীরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই হুমকি প্রদর্শন কোনও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে এক হিংস্র অভিযান শুরু হয়েছে। রাজ্যে প্রায় দেড়শো বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী খুন হয়েছেন। ৪০ হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়া করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় কয়েক হাজার বামপন্থী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জোর করে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন দখল করা হচ্ছে, ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ। শিক্ষার অঙ্গনে ফিরে এসেছে আবার গণটোকাটুকি। শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র সমাজ সকলেই আক্রান্ত। রাজ্যের সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে চলেছে। নারীদের কাছে এই রাজ্য নিরাপদ নয়। নারী নির্যাতনে এই রাজ্য প্রথম এবং নারী ধর্ষণে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। বিধানসভায় বিরোধীদের কোনও মর্যাদা নেই। বিধানসভার অভ্যন্তরে শাসকদলের পুরুষ বিধায়কদের দ্বারা বিরোধী দলের মহিলা বিধায়ক অধ্যক্ষের সামনে নিগৃহীতা হয়েছেন। রাজ্য জুড়ে তৈরি হওয়া এই নৈরাজ্যের পরিবেশের অঙ্গ হিসাবেই মুখ্যমন্ত্রীর এই হুমকি প্রদর্শন।

তাছাড়া রাজ্য সরকারী শিক্ষক সমাজ তাদের অপূর্ণ দাবি-দাওয়া নিয়ে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছে। ইতোমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে তৃণমূলী ফেডারেশনের অনুগামী যে সামান্য কর্মচারী রয়েছেন, তাঁরাও নিজেদের ভুল সংশোধন করে দ্রুত কর্মচারী আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চাইছেন। ফলে দিশেহারা অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করতে, কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মচারী সমাজ জানে এই হুমকি ওদের শক্তির লক্ষণ নয়, দুর্বলতারই চিহ্ন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ অনেক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তারা দেখেছে যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙবার জন্য বিধানচন্দ্র রায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর গণছুটির পূর্বে কংগ্রেস ভবনে এসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কংগ্রেসী নেতা অতুল্য ঘোষ ফেডারেশনকে জন্ম দিয়েছিলেন। ফেডারেশনকে দিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙা যায়নি, পরন্তু ফেডারেশনই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। ওদের যতবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা হয়েছে, ততবারই তা ভেঙেছে। পরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে উপড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। তিনিও পারেননি। সুতরাং এই হুমকির পরিণতিও পূর্বসূরিদের ন্যায় হবে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই কর্মচারী ও তাদের পরিবার-পরিজনকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদে শ্রমজীবীদের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ জরুরি। □

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ নন্দন পত্রিকা, এপ্রিল সংখ্যা ২০১৪)

সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ৪৪তম (নবপর্যায়) দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ১-২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কলকাতায় কমরেড চুনীলাল চক্রবর্তী হলের (সত্যপ্রিয় ভবন) কমরেড ভবতোষ রায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রদীপ নাগ। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ পাল। ১১টি খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক মিলন দাস এবং সমর্থন করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক দশরথ হেমব্রম। আয়-ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ আইনুল কাজী। এছাড়াও দু'টি প্রস্তাব পৃথক পৃথকভাবে উত্থাপন করা হয়। প্রথমটি "সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী স্বৈরাচারী আদেশনামাগুলি বাতিলের দাবিতে" এবং দ্বিতীয়টি "রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে।" প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক প্রণব কর ও সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অতীশ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ও মহিলা টিমের আহ্বায়িকা সুচেতা সাহা ও সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন দাস। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর ৫ জন মহিলা সহ ২৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। বড় অংশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি আন্তরিকতার সঙ্গে সমালোচনা সহ সাংগঠনিক এবং আন্দোলনের বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন পরিস্থিতিকে ভেদ করার আকুতি প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যে প্রকাশ পায়।

সম্মেলনে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় "সমিতির ৯০ বছরের অতিক্রান্তের ইতিহাস" বিষয়ের উপর অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখেন।

পেশকৃত আয়-ব্যায়ের হিসাবের উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ আইনুল কাজী।

দু'দিন ধরে প্রতিনিধিদের বক্তব্যের উপর জবাবী ভাষণ রাখেন সাধারণ সম্পাদক বাণী মুখোপাধ্যায়।

তারপর নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির প্রাক্তন যুগ্ম-সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি প্রসাদ বসু।

সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য ৯৩ জনকে নিয়ে শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণ নির্বাচিত হন। সভাপতি- অশোক ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক- মিলন দাস, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়- সুদীপ পাল, প্রণব কর, দপ্তর সম্পাদক-বিষ্ণুপদ সরকার, কোষাধ্যক্ষ- আইনুল কাজী। □

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে ৫৯তম রাজ্য সম্মেলন ৮-৯ ফেব্রুয়ারি '১৪ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহরের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা কার্যালয় কর্মচারী ভবনে। ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-৩০টায় কোর্ট সংলগ্ন আবাসন স্থল থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে কর্মচারী ভবনে পৌঁছায়। সংগঠনের সভাপতি অশোক গোস্বামী রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং নেতৃবৃন্দের শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রাথমিক কর্মসূচীর সূচনা হয়।

সম্মেলন পরিচালনা করেন সভাপতি অশোক গোস্বামী, সহ-সভাপতিত্রয় অমর ভট্টাচার্য, বাসুদেব সাহা এবং প্রভঞ্জন ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রথমেই প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে মুদ্রিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি তথা অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রণব আইচ। শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টচার্য।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ দে। আয় ও ব্যয়ের হিসাবে পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বলদেব মুখার্জী। প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ এবং প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পবন দাস।

সম্মেলনে উপস্থিত ১৭৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৪ জন প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র আলোচনান্তে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কমরেড অলোক ব্যানার্জী প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রণব চট্টোপাধ্যায়। ১১,২৫০ টাকার বই ক্রয় করেন প্রতিনিধিরা।

সম্মেলন থেকে ৬২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ১৮ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। সভাপতি অশোক গোস্বামী, সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ এবং পবন দাস, কোষাধ্যক্ষ বলদেব মুখার্জী, দপ্তর সম্পাদক শ্যামল দাশগুপ্ত এবং স্মারক পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নন্দী নির্বাচিত হন।

জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার কর্মীরা গণসংগীত পরিবেশন করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
42nd Year 12th Issue, April 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

বর্তমান সরকারের আমলে কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজের অবস্থা

বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া। রাজ্য সরকারী কর্মীদের সংগঠন-আন্দোলন করার অধিকার আক্রান্ত। হুমকি দেওয়া হচ্ছে কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে উপড়ে ফেলার।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

"পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতই শোচনীয়। ফিফ্‌থ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওটা শেষ করে সিক্সথ পে-কমিশনেরও আপ-টু-টেড করতে হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮এর ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজি নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে।...সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্য বেতন পায় অর্ধেক।" ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশিত বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে (পৃঃ ৪৯) সরকারী কর্মচারী ও জনগণের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে আড়াই বছরের বেশি ক্ষমতাসীন রয়েছে। আর একটি লোকসভা নির্বাচন সমাসন্ন। সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া এই সব প্রতিশ্রুতির বর্তমান হাল কী? এই আড়াই বছরের শাসনে কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা (না দমনপীড়ন)-র তালিকাটিই বা কী তার অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।

এক

সর্বপ্রথমে মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, পূর্বে কোনও কংগ্রেসী সরকারই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিটির মান্যতা দেয়নি। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা। ১৯৫৬ সালে এই দাবিতে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে রাজ্যের তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাত্র দু'টাকা হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করেন। ক্ষুব্ধ কর্মচারী সমাজ তা মানি অর্ডার যোগে রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এই মানি অর্ডার গ্রহণ করার জন্য জি পি ও-তে বিশেষ কাউন্টারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ টাকা হারে মহার্ঘভাতা প্রদানে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার তা ছিল সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কর্মচারী আন্দোলন ছাড়াও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই দাবি আদায়ে সাহায্য করে; এক্ষেত্রে বিশেষত পঞ্চাশের দশকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন, বাসভাড়া, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এ বি টি এ'র নেতৃত্বে দুর্বার শিক্ষক আন্দোলন, বাংলা বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আন্দোলনের সামনে ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদানে নীতিভিত্তিক অবস্থান প্রথম গৃহীত হয় ১৯৬৭ সালে; রাজ্যে প্রথম অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর। এর পূর্বে দু-বছর, তিন বছর অন্তর কিছু কিছু মহার্ঘভাতা প্রদান করা হলেও তা মূল্যবৃদ্ধির সাথে বা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় প্রাপ্য মহার্ঘভাতা থেকে অনেক কম ছিল। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মে মাসে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রথম মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে। প্রস্তাবিত এই বৃদ্ধির হার ছিল সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ১৮ টাকা এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ৩২ টাকা ৫০ পয়সা। এর ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ৪৮ টাকা এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ৮০ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই সময় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ৪৭ টাকা এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ১১০ টাকা। অর্থাৎ সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে রাজ্য কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের তুলনায় এক টাকা বেশি মহার্ঘভাতা পেয়েছিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। এই সরকারই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বস্তরের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করেন। ফলে ন্যূনতম মহার্ঘভাতার পরিমাণ হয় ৭১ টাকা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ হয় ৩৬৪ টাকা। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য আরও বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মে দিবসের ছুটি ঘোষণা।

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস নেমে আসে। জনগণের উপর নেমে আসে ব্যাপক দমন-পীড়ন। গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও তাদের সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এর বাইরে ছিল না। সংবিধানে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শীর্ষস্থানীয় তেরোজন নেতৃত্বকে কোনও কারণ না দর্শিয়ে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। একই সাথে নেমে আসে দাবি-দাওয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ। বিশেষত আক্রান্ত হয় মহার্ঘভাতা প্রদানের প্রসঙ্গটি। ফলে এর বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধর্মঘটসহ ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন সাত টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৫ টাকা হারে মহার্ঘভাতা চালু হয়। ১৯৭২ সালে জাল-জুয়াচুরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে কোনও মহার্ঘভাতাই দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে সর্বস্তরের কর্মচারীদের সমহারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ মহার্ঘভাতা দেওয়া হয় তার অর্ধেকই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প (সি ডি এস)-এ জমা রাখতে হত। এক কথায় বলা চলে যে বিধানচন্দ্র রায় থেকে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিই অস্বীকার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি একমাত্র বামপন্থীদের পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট সরকারই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা লাগুও করেছে। আবার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পরিচালিত সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতাকে শুধু অস্বীকারই করেছে তাই নয়, ইচ্ছামত হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে ১৯৭৭ সালে, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পুনরায় রাজ্য কর্মচারীরা পেয়েছেন। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ২৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ৬০ টাকা হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করে বামফ্রন্ট সরকার এবং একই সাথে ১৯৭৯ সালে ১লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এরপর থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়েছে; আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কখনও কখনও মহার্ঘভাতা বাকি পড়েছে ঠিকই; কিন্তু বেতন কমিশনের মাধ্যমে বেতন কাঠামোর পরিবর্তনের সময় বকেয়া কিস্তিগুলি ধরে নিয়েই নতুন বেতনক্রম গঠিত হয়েছে। ফলে এই পার্থক্য স্থায়ী চেহারা পায়নি। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ বোর্ড কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জন্যও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান চালু করে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারী শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিকে কোনোদিনই অস্বীকার করেনি, পরন্তু কিছু বকেয়া পড়লেও বছরে অন্তত দু'বার মহার্ঘভাতার কিস্তি প্রদান করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১১৫·৭৬ পয়েন্টে (২০০১ সালকে ১০০ ধরে) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে সংশোধিত হয়েছে। রাজ্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই সময় থেকেই বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয় এবং তা ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে চালু হয়। ২৭ মাসের বকেয়া আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ৩৩ মাসে বামফ্রন্ট সরকার ৮ কিস্তিতে মোট ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করে যান। ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পূর্বের বকেয়া ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার জন্য দিয়ে যেতে না পারলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ভোট অন অ্যাকাউন্টে করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের এই অভিজ্ঞতার আলোকে গত পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে বিচার করা যেতে পারে।

দুই

বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ২০১১ সালের মে মাসে যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার পরিমাণ ছিল দু-কিস্তিতে (১ জুলাই, ২০১০ থেকে ১০ শতাংশ ও ১ জানুয়ারি, ২০১১ সাল থেকে ৬ শতাংশ) ১৬ শতাংশ। এর মধ্যে ১০ শতাংশের অর্থের সংস্থান বাজেটে বামফ্রন্ট সরকার করেছিল। অর্থাৎ প্রকৃত বাকি ছিল ৬ শতাংশ। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার কারণে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাত্র ১৬ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই আড়াই বছরে রাজ্য সরকারী কর্মচারী-শিক্ষক সমাজের অভিজ্ঞতা কি? ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা (যার মধ্যে ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতার অর্থের সংস্থান বামফ্রন্ট সরকার রেখে গিয়েছিল), বর্তমানে পাঁচ কিস্তিতে (১ জানুয়ারি, ২০১২ সাল থেকে ৭ শতাংশ, ১ জুলাই ২০১২ সাল থেকে ৭ শতাংশ, ১ জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে ৮ শতাংশ, ১ জুলাই ২০১৩ সাল থেকে ১০ শতাংশ, ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ১০ শতাংশ) মোট ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়ে আছে। মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট করার প্রতিশ্রুতির এই হল হাল।

ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে এত বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া নেই। দুই-একটি ছোট রাজ্য বাদ দিলে সব রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা পেয়ে আসছেন। আর এই রাজ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা সরকার প্রতিপালন করছে না।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী-শিক্ষক ও অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের বিপুল লোকসান সহ্য করতে হচ্ছে। বর্তমানে একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর এক শতাংশ মহার্ঘভাতার পরিমাণ মাসে ৬৬ টাকা। অর্থাৎ ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা না পাওয়ার জন্য মাসে ২৭৭২ টাকা বা বছরে ৩৩ হাজার ২৬৪ টাকা সর্বনিম্ন স্তরে একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীর লোকসানের পরিমাণ। একজন গ্রুপ-সি কর্মচারীর (নিম্নবর্গীয় করণিক বা প্রাথমিক শিক্ষক) এক শতাংশ মহার্ঘভাতার মাসিক পরিমাণ ৮৮ টাকা। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে মাসিক বঞ্চনার পরিমাণ ৩৬৯৯ টাকা এবং বছরে তা ৪৪ হাজার ৩৫২ টাকা। কেন্দ্রীয় হারের মহার্ঘভাতার বকেয়া কিস্তিগুলি প্রদান না করে প্রকৃত প্রস্তাবে বেতন সঙ্কোচন বা ওয়েজ ফ্রীজের নীতি চালু করেছে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী বা শিক্ষক মহাশয়দের বা অন্যান্য কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করছে। বর্তমানে এক শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানে রাজ্য সরকারের মাসে ২৫ কোটি টাকা বা বছরে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা না দিয়ে প্রতি মাসে রাজ্য সরকার ১০৫০ কোটি টাকা বা বছরে ১২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রসঙ্গ কিছুদিন ধরে উত্থাপন করছে। রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না; আর এই রাজ্যের প্রতি সেই বঞ্চনা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বৈষম্যের চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু তখন তৃণমূল কংগ্রেস নীরব ছিল বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈষম্যকে মদত দিয়েছে। কিন্তু কর্মচারী শিক্ষক সমাজ ও সচেতন জনগণের প্রশ্ন হল এটাই যে, রাজ্যের কর্মচারী শিক্ষক সমাজকে হাজার হাজার টাকা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার এই সরকারের জন্মায় কি?

বর্তমানে মহার্ঘভাতা না দেওয়ার দায় রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান বা বেতন কমিশন গঠনের অর্থ কেন্দ্র থেকে পাওয়া না গেলে, তিনি এগুলি কার্যকর করতে পারবেন না। অথচ পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় তিনি এই শর্তের উল্লেখ করেননি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়, অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। একথা সর্বজনবিদিত যে, অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশ প্রথম বছরের জন্য কার্যকর (৮৪-৮৫ সাল) না করে পশ্চিমবাংলাকে ৩২৫ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি ও তাদের সাংসদরা লোকসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে ব্যাপক ভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাংসদ ছিলেন। বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দূরের কথা, অন্যান্য দলীয় সাংসদদের সাথে একযোগে এই বৈষম্যকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত নবম লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে কংগ্রেস দলের ১৬ জন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন যার মধ্যে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু রাজ্যের বকেয়া প্রকল্পগুলির অনুমোদন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক বঞ্চনার প্রশ্নে রাজ্যের সাংসদদের এক সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায়

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া

যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।